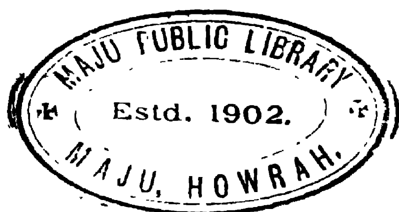
# কমলাকান্তের জীবন-চরিত।

প্রকাশক,

শ্রীহেমচন্দ্র সরকার, এম্, এ।




কলিকাতা,

৭৮ নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট চেরি প্রেসে,

শ্রীতুলসীচরণ দাস দ্বারা মুদ্রিত।

---

১৩১৫।

মূল্য—৸০ বার আনা


শ্রীকমলাকান্ত

# প্রার্থনা।

ভগবানের নিকট

এই প্রার্থনা,

৺ পিতামহী ঠাকুরাণীর

শোকে কাতর বশতঃ

প্রকাশকের

এই গ্রন্থ প্রকাশ-কার্য্যে যে ভুল-ভ্রান্তি হইয়াছে,

তাহা তিনি

ক্ষমা করুন।

# প্রকাশকের নিবেদন।

"কমলাকান্তের জীবন-চরিত" তাঁহার "ডাইরি" দৃষ্টে প্রকাশিত হইল। ভক্তি-ভাজন কমলাকান্ত ব্রহ্মদাস মহাশয়ের ধর্ম্ম-মতের সহিত আমার মতের বিভিন্নতা থাকিলেও, তাঁহার চির-কৌমার্য্য, নিঃস্বার্থ জীব-সেবা, অসাধারণ সরলতা ও পবিত্রতা এবং ভগবৎ-নিষ্ঠা দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া, আমি এই গ্রন্থের প্রকাশ কার্য্যে প্রবৃত্ত হই। এই কার্য্যে প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক শ্রদ্ধাস্পদ ডাক্তার শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহোদয় এবং আমার পরম-সুহৃদ্ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সারদাপ্রসন্ন দাস মহাশয় এবং শ্রদ্ধাস্পদ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চন্দ্রভূষণ ভাদুড়ী মহাশয় সহানুভূতি প্রকাশ ও বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন। তজ্জন্য তাঁহাদিগের নিকট আমি চির-কৃতজ্ঞতা-পাশে বদ্ধ থাকিলাম।

প্রেসিডেন্সী কলেজ,
২৩শে ভাদ্র, ১৩১৫।

শ্রীহেমচন্দ্র সরকার।

# কমলাকান্তের জীবন-চরিত।

## প্রথম পরিচ্ছেদ।

মুর্শিদাবাদ জেলার পশ্চিম সীমান্তে দেওনাপুর বহুজনাকীর্ণ একখানি সুপ্রসিদ্ধ গ্রাম ছিল। ইহার উত্তর সীমায় তুঙ্গ-তরঙ্গময়ী গঙ্গানদী। অতি প্রাচীন কালে পূর্ব্ববঙ্গ মালচী গ্রাম হইতে রাঘবরাম বসু রায় চৌধুরী এখানে আসিয়া বাস করেন। তাঁহারই প্রতিষ্ঠিত রামকান্ত ঘোষ নামক একজন ভদ্রলোক ঐ গ্রামে বাস করিতেন। ইহাঁর রামদেব নামে একমাত্র পুত্র জন্মে। রামদেবেরও একটী মাত্র পুত্র বলরাম ঘোষ এই গ্রামের বসু বংশীয় কুশলরাম রায় চৌধুরীর কন্যাকে বিবাহ করেন। ইহাঁর দুই পুত্র ও দুইটী কন্যা জন্মে। কন্যা দুইটীর গ্রামেই গুহ ও মিত্র বংশে বিবাহ হয়। পুত্রদ্বয় মধ্যে জ্যেষ্ঠ রামকানাই জন্মান্ধতা নিবন্ধন বিবাহ করেন নাই। কনিষ্ঠ পুত্র পদ্মলোচন। তিনিও উক্ত বসুবংশীয় রামগোবিন্দ রায় চৌধুরীর কনিষ্ঠা কন্যা উমা সুন্দরীকে বিবাহ করেন। তাঁহার গর্ভে দুই পুত্র ও এক কন্যা জন্মে; জ্যেষ্ঠ কালী প্রসাদ, কনিষ্ঠ কমলাকান্ত। কন্যাটীর নাম হরশঙ্করী। কমলাকান্ত ১২৪৪ সালের ১৯শে মাঘ জন্ম গ্রহণ করেন।

পদ্মলোচন ঘোষ, পুত্রদ্বয় ও কন্যাটীর অল্প বয়ঃক্রম সময়ে, ভীষণ রোগে আক্রান্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করেন। নিরাশ্রয়া উমাসুন্দরী পুত্রদ্বয় ও মেয়েটীকে লইয়া বড়ই বিপদ্গ্রস্ত হইয়া পড়িলেন। ঐ ঘোষ বংশের পুরোহিত অতি বৃদ্ধ রামলোচন চক্রবর্ত্তী। তিনি তাঁহাদের রক্ষণাবেক্ষণ

করিতেন। ১২৫০ সালের অগ্রহায়ণ মাসে কালীপ্রসাদ ১১ বৎসর বয়সে জ্বরবিকারে অসহায়া মাতাকে শোক সাগরে ভাসাইয়া গেলেন। কন্যাটীর বিবাহ সম্পন্ন হইলে, একমাত্র কমলাকান্তকে অবলম্বন করিয়া উমাসুন্দরী অসহ্য দুঃখ যন্ত্রণার ভিতরে দিনাতিবাহিত করিতে লাগিলেন।

এখানে অন্য এক ঘোষ বংশীয় গুরুপ্রসাদ ঘোষ নামে জনৈক সাধু পুরুষ বাস করিতেন। তাঁহার একমাত্র শতাধিক বর্ষীয়া অতি স্থবির অন্ধ মাতা ছিলেন। ঘোষ মহাশয় সমস্ত রজনী মোহমুদ্গর প্রভৃতি সদ্‌গ্রন্থ আবৃত্তি করিতেন। দিবসে সাধুসেবা ও শাস্ত্রপাঠে নিরত থাকিতেন। মুহূর্ত্তকালও বৃথাকার্য্যে নষ্ট করিতেন না। তাঁহার একটী পাঠশালা ছিল। উহাতে বহুতর ছাত্র অধ্যয়ন করিত। কমলাকান্ত ঐ পাঠশালায় পড়িতেন। শীতকালে পশ্চিম প্রদেশের "রামাত জামাতের" সাধুগণ জগন্নাথ ক্ষেত্র বা সাগর সঙ্গম দর্শনার্থ বাহির হইতেন। এক একটী জামাতে ৪০।৫০ এমন কি, শতাধিক সাধু সময়ে সময়ে আসিতেন। দেওনাপুর গ্রাম দিয়া যে বাদসাহী প্রশস্ত পথটী প্রচলিত ছিল, সর্ব্বদাই রামাত প্রভৃতির উহাতে গমনাগমন হইত। ঘোষ মহাশয় ঐ সকল জামাতের সাধুগণকে আপন বাড়ীতে স্থান দিয়া ভক্তির সহিত ভোজন করাইতেন। তিনি জামাতের মোহান্ত ঠাকুরের সহিত অনেকরূপ ধর্ম্মালোচনা করিয়া পরমানন্দ ভোগ করিতেন। তাঁহার মুখখানি কেহ কখনও বিষাদভাবে আক্রান্ত দেখেন নাই। সদালোচনা ব্যতীত অসার বিষয়ে যোগ দিতেন না। তিনি মাদ্রাসা কি টোলে কখনও পারসী বা সংস্কৃত পড়েন নাই। কিন্তু সূক্ষ্ম বুদ্ধি প্রভাবে হিন্দী সারগর্ভ পদ্য এবং সংস্কৃত ভাষায় 'বিষ্ণুভক্তি তত্ত্বজ্ঞান" নামে একখানি অত্যুৎকৃষ্ট পুস্তক লিখিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন হিন্দী ভাষায় যে কত হৃদয়-গ্রাহী পদ্য লিখিয়াছিলেন বলা যায় না। তাহার মধ্যে ১২টী হিন্দী পদ্য এখানে উদ্ধৃত করা গেল।

( ১ )

প্রেমসে হরিগুণ বোবা বোলে অন্ধ হরিকো দেখে,
বহেরা হরিগুণ শোনে নাচে পঙ্গু হরিধন লেকে।
শ্রীগুরু প্রসাদ কহে চারকো সেব মনুয়া,
এহি চারকো পেটভরা হায় হরি মিলনকা কিমিয়া।

( ২ )

চার বেদ জিহ্বামে বৈঠে এইসা পণ্ডিত হোয়,
ভাবভক্তি আউর প্রেম এ তিন না হোয়,
যেইসা দেহী সব খপসুরত নাকটামে গলৎ,
গুরুকা বাণী তেইসা ভয় পণ্ডিতকা ভাই কিম্মৎ।

( ৩ )

এক হরিকা পূজামে সব দেবকা হোয় পূজা,
এক হরিকা নামমে সব তীরথ হোয় সোজা,
এক হরিকা জনকো প্রেমভক্তিসে পূজেগা,
কহে গুরু দেব তীরথকা ফল ঘর বৈঠে মিলেগা।

( ৪ )

এক তারমে বাঁধা হায় সব মূরখ জ্ঞানী ধ্যানী,
যেইসা কলকা পুতলী নাচে এইসি নাচে জাহানী,
কলদারকা সব কুদরত হায় পুতলী জিস্‌কা তাবে,
যেইসা নাচাবে তেইসি নাচে হর্‌রং বাতাবে,
যব কল টুটা তব সব ঝুটা বন্ধ হুয়া লাফানা,
কহে গুরু দেখ আজব তামাসা দুনিয়াকা কারখানা।

( ৫ )

পাঁচরঙ্গমে খেলা যেইসা খেলতা হায় সতরঞ্চ,
পাঁচকো কিস্তি লাগ্‌তে লাগ্‌তে রাজা হোয় বন্ধ,

এইসা মনকো পাঁচ তত্ত্বমে পাঁচ তরক্‌মে টানে,
কহে গুরু পাঁচকা বশ হোকে মনুষ্যা নেক বুরা না চেনে।

( ৬ )

দুনিয়াদারি মায়াজালমে রহকে হরিকো মিলে,
যো খানা-পিনা চল্‌না ফিরণামে নাহি হরিকো ভুলে,
কহে গুরু মত ভাব তফাৎ মেরা এহিবাৎ,
জলমে রহকে কমল পত্তর যেইসা জলমে রহে তফাৎ।

( ৭ )

চন্দনকা দরককা বায়ু যো দরকমে লাগে,
সো দরক চন্দন হোতা হায় কুদরত জিস্‌কা জাগে,
এইসি ভাই দরশন পরশন করতা হায় যো শান্ত,
শ্রীগুরু প্রসাদকা বাণী উস্‌কি হোগা শান্ত।

( ৮ )

যেইসা বনমে শিরমে লেকে ফিরে শবদ্‌কো হাঁড়িয়া,
উজিয়ালামে শূরতা রাখকে জ্ঞান গোঁয়ায় হরনীয়া,
এইসা মায়া মিছা কো যো সাচ্চা ভাবে কোই,
কহে গুরু যো হরণিয়াকা ঘটনা উস্‌কা ঘটনা সোই।

( ৯ )

সাধুতানে নাস্ত হোয় তোভি ভগবৎ প্যারা,
বদ্‌হোকে দৌলৎকা ঢেরী উস্‌কা কিম্মৎ থোরা,
যেইসা ফাটা-ফুটা পাগড়ি তওভি শিরপর রহনা,
কহে গুরু চক্‌মক্ জুতি পায়েরসে উপর চড়তে মানা।

( ১০ )

হরিগুণানমে দুলান চাপে পাশ-গপ্‌মে আসক,
সজ্জন দেখকে জলতারহে বুরামে লাগে টাটক,

জিস্‌কা হায় ভারি দৌলৎ উস্‌কো খুব খিলাবে,
কহে গুরু ভুখা দুখা যোঁ কোই মুষ্টিভর না পাবে।

( ১১ )

ছোটা লেড়কা আয়না দেখ্‌কে খোস রহে হরদম্‌,
এইসা মায়াধারী লোক মায়ামে হায় বন্ধ্‌,
শ্রীগুরু প্রসাদ প্রভুকো যোড়তাহায় দো হাত,
নিজ গুণ সো নিজ চরণ সো মৎকরো তফাৎ।

( ১২ )

ঘস্‌তে ঘস্‌তে চন্দনকা যো ছুট্‌তা হায় সুবাস,
হরি ভজনকা এইসি রীতি মৎ হও নিরাশ,
হরদম্‌ ঘর্ষণ হরিগুণান্‌ করো ভাই জাহানী,
কাট জাগা সব মায়াজাল ঘোষ গুরুকা বাণী।

---

ভগবদ্ভক্ত গুরুপ্রসাদ ঘোষের মাতৃসেবা ও সাধু ভক্তি হইতে জানা যায় তাঁহার জীবনে স্বেদ, কম্প, রোমাঞ্চ প্রভৃতি অষ্ট ভাবের লক্ষণ ও অনাসক্ত বৈরাগ্য, অবিচ্ছিন্ন প্রেম, অকৈতব ভক্তি অতি সুন্দর ছিল। সর্ব্বদা "হরের্ণাম-হরের্ণাম হরের্ণামৈব কেবলম্‌" এই মহামন্ত্রটী উচ্চারণ করিতেন। পার্থিব সুখৈশ্বর্য্য বাসনা কিছুমাত্র ছিলনা। দুঃখী দরিদ্রগণকে তাহাদের ইচ্ছামত ভোজন করাইতেন, কিন্তু স্বয়ং একখানি স্বদেশী মোটা বস্ত্র অতি মলিন ও জীর্ণ, তাহাই পরিধান করিয়া থাকিতেন। মাতার জন্য আতপায় যাহা রন্ধন করিতেন তাহারই অবশিষ্ট ভোজনে পরিতৃপ্ত হইতেন। কোনও দিন মাতার অনুমতি ক্রমে একটু ভালরকম খাদ্য সংগ্রহ করিতেন। হরিনাম কীর্ত্তনে "লুট" দেওয়ার প্রবৃত্তি বড় বেশী ছিল। ছাত্র দিগের সঙ্গে উচ্চৈঃস্বরে "হরিবোল হরিবোল" বলিয়া নৃত্য করিতেন।

সাধুঘোষ মহাশয়ের বয়োবৃদ্ধি সত্ত্বেও বাল-স্বভাব সুলভ ছাত্র-বৃন্দের ন্যায় বড় কৌতুক আমোদ করিতেন। এদেশে মুঞ্জ নির্ম্মিত একপ্রকার পণ্য পাত্র প্রস্তুত হয়, তাহাকে সকলে "মুনি" বলে। একদিন একটী জীর্ণ "মুনি" একখানি বাতির অগ্রে উচ্চ ভাবে এক পার্শ্বে তুলিয়া রাখেন। ছাত্রদিগকে হাসিয়া হাসিয়া বলিলেন, "দেখ ঋষির কেন শূল হইল ?" অনেক ছাত্রই বুঝিতে পারিল না। তাহার মধ্যে অল্পবয়স্ক একটী ছাত্র অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইল "ঐ দেখুন বুড়ো হ'লে কি ঋষির ঐরূপ সাজা হয়, তবে আপনারও কি হইবে ?" ঘোষ মহাশয়ের আনন্দ আর ধরে না। ছেলেটীকে ক্রোড়ে লইয়া মুখ চুম্বন করিতে করিতে নাচিতে লাগিলেন, মাথায় হাত বুলাইয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন, "বাবা, চিরজীবী হও। তোমার বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাইয়া বড় সুখী হইলাম। "মুনি" অর্থে তুমি যে ঋষি বুঝিয়াছ ইহাতেই তুমি ধন্যবাদ পাইবার পাত্র। তোমার বাল-স্বভাব বাক্‌চাতুর্য্যে আমার প্রাণ মুগ্ধ হইয়াছে।"

———:-:———

# দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

১২৫৮ সালে দেওনাপুর গ্রাম খানি সম্পূর্ণরূপে গঙ্গানদীর অতল উদরে প্রবেশ করিল। সেই স্থানের জমিদারগণকে একণে অন্যের অধিকারে বাস করিতে হইল। মহাদেব নগর নামক গ্রামের দক্ষিণ প্রান্তরে সমতল ক্ষেত্রে সকলে বাসগৃহ নির্ম্মাণ করিলেন। ঐ স্থানে একটী কাঞ্চণ বৃক্ষ ছিল। সেই জন্য "কাঞ্চণ তলা" গ্রামের নাম হইল। ঐ বিস্তৃত ক্ষেত্র মধ্যে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈশ্য প্রভৃতি সকলেই বাস করিলেন।

এই সময় কমলাকান্তের বয়স ১৪ বৎসর। তিনি লেখা পড়া বিশেষ রূপ জানেন না। তজ্জন্য সর্ব্বদা বিমর্ষ থাকেন। মঙ্গলময় বিধাতার কৃপা অপার! এক জন জমিদারের প্রধান কর্ম্মচারী (নায়েব) মহেশ চন্দ্র বাগ্‌চী তাঁহাকে আশ্রয় দিলেন, এবং জমিদারী কার্য্য যত্নের সহিত শিক্ষা দিতে লাগিলেন। কমলাকান্ত অল্প সময়েই কার্য্যোপযোগী হইয়া উঠিলেন। কিন্তু এই সুবিধা টুকু আর থাকিল না। প্রাণবন্ধু নামে জনৈক ব্রাহ্মণ সন্তান বাগ্‌চী ঠাকুরের আশ্রয় গ্রহণ করিলে পর, কমলাকান্ত অসুবিধাবোধ করিয়া চলিয়া আসিলেন। গ্রাসাচ্ছাদনের বড়ই অনাটন হইয়া উঠিল, এমন কি, কোনও কোনও দিন অনশনেও থাকিতে হইত। ইহা দেখিয়া তাঁহার সমপাঠী আনন্দ মোহন সেন বলিলেন "তুমিত কম্পাস জরিপ শিখ নাই, দেখ, আমি সর্ভে জরিপ জন্য ইন্দ্রানী সের পুর যাইতেছি, তুমি কি সঙ্গে যাইতে পারিবে? কমলাকান্ত বলিলেন, "অবশ্যই যাইব।" মাতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তাঁহার মাতা অশ্রুপূর্ণ লোচনে অনুমতি দিলেন। কমলাকান্তের প্রসাদ সাহা নামে একটী বন্ধু ছিলেন। তাঁহাকে বলিলেন "ভাই! আমি আনন্দ মোহন সেনের সঙ্গে সর্ভে জরিপ জন্য যাইতেছি, মাকে দেখিও প্রসাদ সাহা বলিলেন, "মা থাকিলেন. ভয় কি?" কমলাকান্ত ইন্দ্রানী সের পুর চলিয়া গেলেন। কিন্তু সেখানে কিছু করিতে পারিলেন না, নিঃস্ব হস্তে ফিরিয়া আসিলেন।

সংসারে অকৃত্রিম বন্ধু অতি বিরল। কমলাকান্তের হৃদয় সুহৃৎ প্রসাদ সাহা তাঁহার অনুপস্থিতিতে ভক্তির সহিত মাতৃদেবীর আদেশ পালনের ত্রুটি করেন নাই। বন্ধুত্বের স্থায়িত্ব জাতি নির্ব্বিশেষে সংঘটিত হয় না; স্বজাতি স্বগ্রাম বাসী আনন্দ-মোহন সেনও উপরি উক্ত ঐ ধার্ম্মিক প্রসাদ সাহার নিকট পরাভূত।

কমলাকান্তের রাজ কিশোর বসু রায় চৌধুরী নামে একমাত্র মাতুল ছিলেন। তাঁহার বয়ঃক্রম পঞ্চাশ বৎসর। তিনি তাঁহার জ্ঞাতির জমিদারীর অংশ মোকর্দ্দমা করিয়া প্রাপ্ত হন। তথাচ কমলাকান্তের সাহায্য কিছুই করিতে পারেন নাই। এই বৃদ্ধ সময়ে তিনি পুনরায় বিবাহ করেন। কলমাকান্তের মাতুলানী সবে মাত্র একমাস ১২ দিন সধবা ছিলেন। বিবাহের পরই পিতৃগৃহে চলিয়া যান। সুতরাং তাঁহার আর স্বামী সন্দর্শন ঘটে নাই। মাতুলানী বিমলা সুন্দরী পিতৃগৃহ হইতে কাঞ্চন তলারবাড়ী আসিলে তাঁহার রক্ষণাবেক্ষণ জন্য গ্রামের সাধু প্রকৃতি সরল ভাবাপন্ন ব্যক্তিগণ কমলাকান্তের মাতাকে অনুরোধ করিলেন। তিনিও সকলের অভিপ্রায় এবং কর্ত্তব্য কার্য্য বুঝিয়া অতি যত্নের সহিত তত্ত্বাবধান করিতে থাকেন। কিন্তু এই অনুষ্ঠানটী বৃথা হইল। কেননা গ্রামের কোন জমিদার ঐ জমিদারীর অর্দ্ধাংশ বাহির করিয়া আত্মসাৎ করিলেন। রাম কৃষ্ণ মিত্র নামে কমলাকান্তের মাসতুতো ভাই ও নিজে কমলাকান্ত ইহাঁরা উভয়ে মাতুল সম্পত্তিতে হতাশ হইলেন। কিছু দিন পর রামকৃষ্ণ মিত্র সপরিবারে পাবনায় শ্বশুরবাড়ী চলিয়া গেলেন।

১২৬৫ সালে কমলাকান্তের প্রতিবাসী গোলকচন্দ্র রায়ের বাড়ীতে হঠাৎ একদিন দিবা দুই প্রহরের সময় আগুন লাগিল। তথনই কমলাকান্ত দাদার ঘর হইতে বৃহৎ রকমের সিন্দুক নানা কৌশলে বাহির করিয়া অন্যান্য দ্রব্যাদি রক্ষার চেষ্টা করিতে করিতে কোথায় যে গেলেন, তাঁহার মাতা জানেন না। পুত্রের অনুপস্থিতি নিবন্ধন তিনি বড়ই ব্যাকুল হইলেন। এথানে একটী বিধাতার করুণার ব্যাপার দেখুন। প্রথমতঃ রায় চৌধুরীর বাড়ীর অগ্নি নিবাইতে পারিলে ভয়ানক অগ্নিকাণ্ডে সকলেই রক্ষা পায়, বোধ হয় ইহাই চিন্তা করিয়া কমলাকান্ত প্রতিবাসীর বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করেন। সে সময়

রায় চৌধুরী মহাশয় বাড়ীতে ছিলেন না। পশ্চিম দ্বারী ঘরখানি প্রথম পুড়িতেছে, একটী মানুষও নাই। কেবল দুইটী বৃদ্ধা ছিলেন, তাঁহারা বড়ি আমসত্বের হাঁড়ি লইয়া দূরে হায় হায় করিতেছেন। রায় চৌধুরীর ক্ষীরকণ্ঠ সদ্যশিশু দৌহিত্রটী দক্ষিণদ্বারী ঘরের বারন্দায় হাত পা নাড়িতেছে, তাহাকে কাহারও মনে নাই। ছেলের মাতা অগ্নি ধরিবার পূর্ব্বে স্নান করিতে যান, তিনি এই ভীষণ অগ্নিকাণ্ডে "হায় ছেলে গেল" বলিতে বলিতে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়াছেন। এদিকে কমলাকান্ত ব্যস্ত ভাবে ছেলেটীকে কাঁথায় আবৃত করতঃ বুকে লইয়া বাহির হইতেছেন: এমন সময় ছেলেটীর মাতা কাঁদিয়া বলিলেন, "দাদা! আমার ছেলে গেল।" কমলাকান্ত "ভয় নাই" বলিয়া কাঁথা আবৃত ছেলেটীকে তাঁহার হস্তে দিলেন। আর বিলম্ব করিলেন না, তাড়াতাড়ি বাড়ী আসিয়া দেখেন তাঁহাদিগেরও বাড়ী পুড়িতেছে। কমলাকান্তকে দেখিয়া তাঁহার মাতা একটু বিরক্তভাবে বলিলেন, "এ সময় কি কোথাও যাইতে আছে?" কমলাকান্ত ছেলেটীর ঘটনা বলিবামাত্র তাঁহার মাতা সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, "বেশ করিয়াছ"। দেখিতে দেখিতে তাঁহাদিগের বাড়ির ঘর কয়খানি পুড়িয়া গেল। এদিকে পাবনা হইতে কমলাকান্তের মাসতুতো ভ্রাতা রামকৃষ্ণ মিত্রের মৃত্যু সংবাদ আসিল। কমলাকান্তের মাতা শোকে মর্ম্মাহত হইলেন। কমলাকান্তও বড় অধীর হইয়া পড়িলেন। তাঁহার মাতাই আবার পুত্রকে সান্ত্বনা বাক্যে প্রকৃতিস্থ করিলেন।

---

# তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

এই সময় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রণীত শকুন্তলা, তারাশঙ্কর তর্করত্নানুবাদিত কাদম্বরী, অক্ষয় কুমার দত্তের চারুপাঠ প্রভৃতি বাঙ্গলা সাহিত্য এবং তত্ত্ববোধিনী, প্রভাকর, সোমপ্রকাশ এই সকল সংবাদ

পত্র বাহির হয়। কমলাকান্তের সেকালের "গুরুদক্ষিণা," দাতাকর্ণ, প্রহ্লাদ চরিত্র পর্য্যন্ত সাহিত্য বোধ ছিল। তাঁহার এমন সংস্থান ছিলনা যে পাশ্চাত্য উন্নতির সোপান পুস্তক সমূহ ও সংবাদ পত্র লন। অবস্থোচিত শিক্ষার সহজোপায় ভাবিয়া গ্রামের একটী তরুণ যুবক মহেশচন্দ্র মিত্রকে উপদেশ দিয়া, তাঁহার দ্বারা উপযুক্ত পুস্তক সমূহ ও সংবাদ পত্র তিনখানি সংগ্রহ করাইলেন। ঐ সকল কাগজ রীতিমত আসিতে লাগিল। দেশহিতৈষী অক্ষয়কুমার দত্ত, কবিশ্রেষ্ঠ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, নীতিবিশারদ দ্বারকা নাথ বিদ্যাভূষণ ইহাঁদের ধর্ম্মনীতি, সাহিত্য জ্ঞানপূর্ণ উপদেশে যথেষ্ট উপকার হইল। কমলাকান্ত অবসরমত এই ক্ষুদ্র লাইব্রেরীতে যাইয়া সংবাদ পত্র তিনখানি পড়িতেন। যেদিন যে পুস্তক শুনিতে ইচ্ছা হয়, মহেশচন্দ্র মিত্রকে বলিলেই তিনি যত্নের সহিত পাঠ করিতেন। কমলাকান্ত মহেশচন্দ্র মিত্রের বয়োজ্যেষ্ঠ; সম্পর্কে দাদা হইতেন। তাঁহার কথা তিনি অতি ভক্তির সহিত গ্রহণ করিতেন।

এইভাবে সংবাদ পত্র ও পুস্তকাদির আলোচনায় ক্রমেই উৎসাহ প্রবল হইয়া উঠিল। একদিন কমলাকান্ত মহেশচন্দ্র মিত্রকে অতি স্নেহভাবে বলিলেন, "মহেশ! এসময় একটী কোনওরূপ সভা সংস্থাপিত করিলে কি হয় না? আমার যেন মনে হয় নূতন নূতন প্রবন্ধের আলোচনা করিলে আমরা বিশেষ ফল পাইতে পারি। আমাদের গ্রামের প্রসন্ন কুমার রায়, শ্রীমন্ত রায়, কৃষ্ণমোহন চক্রবর্ত্তী ইহাঁদিগকে জানাইলে এই কার্য্যটী অবশ্যই সম্পন্ন হইতে পারে।" মহেশচন্দ্র আগ্রহ সহকারে প্রত্যেকের বাড়ী গিয়া বলিলেন; সকলেই উৎসাহের সহিত ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। আন্তরিক উৎসাহ উদ্যমে "বিজ্ঞান মনোতোষিণী" নামে সভা প্রতিষ্ঠিত হইল। ইহা দ্বারা সকলেই জ্ঞান লাভ করিতে লাগিলেন।

পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে সেই কুশলরাম রায় চৌধুরী; তাঁহার পৌত্র রামকুমার রায় চৌধুরী কমলাকান্তের খুড়া হন। দুর্ভাগ্য বশতঃ তাঁহার জমিদারীর অংশ নিলাম হইয়া যায়। পরাধীন হইয়া দেওনাপুর পরস্তি মহালে তহশীলদারী কর্ম্ম করিতেন। কমলাকান্তকে ঐ কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। এই ভাবে ১২৭২ সাল পর্য্যন্ত চলিয়া গেল। কমলাকান্ত এক দিনের জন্যও তাঁহার খুড়ার স্নেহ ভাব ভিন্ন অসন্তোষের কারণ কিছু বুঝিতে পারেন নাই।

কালচক্রের আবর্ত্তনে ১২৭৩ সাল, আসিয়া উপস্থিত হইল। এই সাল পূর্ব্বোক্ত রায় চৌধুরী মহাশয়ের পক্ষে বড়ই ভীষণ, তিনি অরঙ্গাবাদ কনসারণের সাহেবের অধীনে কার্য্য করিতেন। উক্ত কনসারণ অপরের হস্তগত হওয়াতে তাঁহাকে ঐ জীবিকা নির্ব্বাহের একমাত্র উপায় দেওনাপুর দেয়ারের তহশীলদারী কার্য্য হইতে অপসৃত হইতে হইল। সুতরাং কমলাকান্ত আপাততঃ বাড়ী আসিয়া অবস্থিতি করিলেন। পরে জগদ্বন্ধু রায় চৌধুরী প্রভৃতি ঐ কনসারণের অংশ ক্রয় করিলে তিনি মালঞ্চা গ্রামের তহশীলদারী কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন।

ঈশ্বরের নিয়োজিতকার্য্য মানবের বুঝিবার সাধ্য নাই। এই বৎসর রাজকীয় আইনের বলে প্রজার উপর ইন্‌কম্‌ট্যাক্‌স ধার্য্য হইতেছিল। মালঞ্চা মহালের প্রজাগণের উপর উক্ত কর স্থাপন করার জন্য জনৈক মৌলবী আসেস্যর এবং তাঁহার সঙ্গে নবীনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য নামক এক হিন্দু কর্ম্মচারী আইসেন। উক্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয় প্রজাদিগকে বলিলেন "দেখ তোমাদের আয় বৎসরে পাঁচশত টাকার অধিক এজন্য ট্যাক্স দিতে হইবে।" সেই প্রজারা আয় সম্বন্ধে নানারূপ আপত্তি করিয়া অনেক অনুনয় বিনয় করিল সেই সময় কমলাকান্ত প্রজাগণের অনুকূলে বিশেষ সন্তোষজনক প্রমাণ দেখাইয়া ঐ ভীষণ করভার বহন দায় হইতে অব্যাহতি জন্য যত্ন করেন।

ভট্টাচার্য্য মহাশয়, বড়ই দয়াদ্র চিত্তের ব্যক্তি। প্রজার অবস্থা প্রত্যক্ষ করিয়া সমসের গঞ্জ থানায় আসৈপারের নিকট গেলেন।

সরলতার মূলে যে গরল নিহিত থাকে, ইহা কমলাকান্ত জানিতেন না। ইতি পূর্ব্বে মালঞ্চা গ্রামে কোন একটী ঘটনা সূত্রে সেই স্থানের একটী প্রধান ব্যক্তিকে একটুকু ভদ্রোচিত ভৎসনা করিয়া ছিলেন। তজ্জন্য কমলাকান্তের সহিত তাঁহার মনোমালিন্য জন্মে। ঐ প্রধান ব্যক্তিটীকে ট্যাক্সের গুরুভার বহন করিতে না হয়, তৎসম্বন্ধে কমলাকান্ত নবীন বাবুর নিকট সবিশেষ অনুরোধ করেন, কিন্তু তাঁহার পূর্ব্বোক্ত কার্য্য নিবন্ধন কৃতজ্ঞতাসূত্রে জড়িত থাকা দূরে থাকুক বরং সুযোগ পাইয়া অনেক গুলি প্রজাকে কুমন্ত্রণা দ্বারা বশীভূত করতঃ ঐ নিরীহ ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে তাঁহারই যোগে উৎকোচ দেওয়া ইত্যাদি মিথ্যা অভিযোগ উপস্থিত করেন। এই অভিযোগের সূত্রপাতেই কমলাকান্ত আপন নিকাশী কাগজ পত্র প্রস্তুত করিয়া সদর কুঠি অরঙ্গাবাদ নিকাশ পরিষ্কার জন্য যান। নিকাশ কার্য্য সমাধা হইলে মুক্তি পত্র লইয়া বাড়ী আইসেন।

জঙ্গীপুরের ডিপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট উৎকোচ গ্রহণের ও দানের মোকর্দ্দমা উপস্থিত হয়। ডিপুটী বাবু নবীন ও কমলাকান্তকে ফৌজদারীতে আসামী করিলেন, সরকার বাহাদুর বাদী হইলেন। প্রজারা সাক্ষী শ্রেণীভুক্ত হইল। শমন আসিলে আসামী এবং সাক্ষীগণকে বিচার দিনে ফৌজদারী কোর্টে হাজির হইতে হইল। ইতি পূর্ব্বে দয়াদ্র হৃদয় কমলাকান্তের গ্রামবাসী হরিহর মিত্র মহোদয় জঙ্গীপুরের প্রধান প্রধান মোক্তার উকিলগণকে এই মিথ্যা অভিযোগের মূল ঘটনার কারণ সমূহ জানাইয়াছিলেন। তিনিও স্বয়ং একজন বিখ্যাত মোক্তার; সুতরাং সকলেই বিনা অর্থে সাহায্য করিয়াছিলেন। ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুর নবীন ও কমলাকান্তকে দায়রায় সোপর্দ্দ

করিলেন। কিন্তু জামিন লইয়া দায়রার বিচার কাল পর্য্যন্ত খালাস দিলেন। কমলাকান্ত মোকর্দ্দমার নথির নকল লইয়াবাড়ী আসিলেন। এমন বিপদ মাথার উপর; ইহাতে কমলাকান্ত অধীর হন নাই, বরং স্ফূর্ত্তির সহিত সকলের নিকট হাসি কৌতুক করেন, সমবয়স্কেরা অনেকেই তাঁহার এইরূপ স্ফূর্ত্তি দেখিয়া বলিয়াছিলেন, "ওহে তোমার উপর এতবড় দায়রার মোকর্দ্দমা; তুমি কি সাহসে বেড়াইতেছ?" কমলাকান্ত উত্তর দিলেন, "সত্য যদি সত্যই হয়, তবে ভয় কি? সকলেই ত বলিয়া থাকেন, সত্যের জয় চিরদিন, ভাবনার বিষয় কি?"

১২৭৬ সালের শীতকালে দায়রার মোকর্দ্দমার দিন ছিল। আসামী ও সাক্ষীদিগের নামে সমন বাহির হইল। কমলাকান্ত মুর্শিদাবাদ যাইবার পূর্ব্বে তাহার পরম সুহৃদ্ দুর্লভচন্দ্র দাসকে ডাকাইয়া বলিলেন, "দুর্লভ দাদা, আমি ত আজ দায়রার মোকর্দ্দমায় মুর্শিদাবাদ যাইতেছি। মা থাকিলেন, তাঁহাকে দেখিও, কোনও বিষয় যেন কষ্ট না পান।" কমলাকান্তের মাতা অত্যন্ত ধৈর্য্যশালিনী ছিলেন, তথাপি অশ্রু সংবরণ করিতে পারিলেন না। দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন, "কমল, মনে মনে কতই আশা করিতাম, এখন একটু সুবিধার মত হয়েছে— আর কি বলিব, সকল আশাই বুঝি শেষ হয়।" দুর্লভ চন্দ্র অশ্রু সংবরণ করিয়া বলিলেন, "মা আপনি চিন্তা করিবেন না, কখনই ঘোষ দাদাকে কষ্ট ভোগ করিতে হইবে না। যখন যে প্রয়োজন হইবে অবশ্যই বলিবেন।" কমলাকান্ত দুই বৎসরে যাহা কিছু আয় করিয়াছিলেন খরচ বাদে ২৪৪৲ টাকা দিয়া দুর্লভ চন্দ্র দাসকে বলিলেন "এই টাকা গুলি যাদব চন্দ্র দাসের নিকট গচ্ছিত রাখিয়া দিলে ভাল হয়, এক্ষণে আমি চলিয়েছি।" নিজের সঙ্গে ত্রিশটী টাকা আর শোক দুঃখ জড়িতা বৃদ্ধা মাতার চরণধূলি সম্বল।

বহরমপুরে মোকর্দ্দমা আরম্ভ হইল। নবীন ও কমলাকান্ত কাঠরার ভিতরে প্রবেশ করিলেন। বাগ্মীবর ডাক্তার (এইক্ষণকার সার) গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় উকীল মহাশয় বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন। তাঁহার বক্তৃতায় জজ বাহাদুর, জুরীগণ, ডিষ্ট্রীক্টবাসী অনেক ভদ্রলোক সকলেই স্তম্ভিত ও মুগ্ধ হইয়া গেলেন। শেষ কমলাকান্তের উকীল বৃদ্ধ শ্যামাচরণ ভট্ট মহাশয় অতিগম্ভীর ভাবে কয়েকটী বিষয় বক্তৃতা করিয়া সন্দেহ ভঞ্জন করিলেন। একটু পরে কাঠরার দ্বারের দুই পার্শ্বে সঙ্গীন চড়ান বন্দুক লইয়া ভীষণাকৃতি দুইজন সিপাহী দাঁড়াইল। জুরী মহাশয়েরা মন্ত্রণাভবনে গমন করিলেন। নবীন পৈতায় হাত দিয়া জপ করিতে বসিলেন। কমলাকান্ত একদৃষ্টে জজ্ সাহেবের মুখপানে চাহিয়া থাকিলেন, জুরীরা বাহিরে আসিয়া প্রত্যেকেই বলিলেন, "আসামীগণ নির্দ্দোষী।"

সেই সময়ে নবীন ভট্টাচার্য্যের একটী ভাই কমলাকান্তকে বলিলেন, "অনেকেই বলিতেছে, সাক্ষীরা সাক্ষ্য দিতে যেরূপ খেলাপ করিয়াছে, দরখাস্ত করিলে নিশ্চয়ই সাজা পাইবে ; এ বিষয়ে আপনার অভিপ্রায় জানিতে দাদা আমাকে পাঠাইলেন।" কমলাকান্ত উত্তর দিলেন, "তাহা কি ঠিক? কোন না কোন সময়ে অপরাধ হইয়াছিল, নতুবা এতটা কষ্ট পাইব কেন? আমরা যে মুক্ত হইলাম ইহাই যথেষ্ট—আবার কেন?" তাঁহার কথায় সকলেই সন্তুষ্ট হইলেন।

কমলাকান্তের স্বগ্রামবাসী সুহৃদ শ্রীনাথ রায়চৌধুরী তাঁহাকে এই সময় সাহায্য করেন। তিনি খাগড়া বহরমপুরের পরিচিত ভদ্র মণ্ডলীকে আহ্বান করিয়া নিজ ব্যয়ে জলযোগ করাইলেন। দুই তিন দিন সহর ভ্রমণের পর তিনি কমলাকান্তকে সঙ্গে লইয়া বাড়ী গেলেন। কমলাকান্ত মাতৃ দর্শন মানসে বাড়ী চলিয়া গেলেন। মাতার পদধূলি মস্তকে রাখিয়া বলিলেন "মা! আমি খালাস পাইয়াছি।" তাঁহার মাতা আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন এবং 'দীর্ঘায়ু হও' এই বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন।

কমলাকান্ত দায়রার মোকর্দ্দমায় খালাস পাইয়া বাড়ী আসিলেন। এই সংবাদ তাঁহার দুর্দ্দভ দাদা শুনিবা মাত্র উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া আসিলেন। অন্যান্য বন্ধুগণও উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। কমলাকান্ত বান্ধবোচিত কথা বলিয়া সকলকে সুখী করিলেন।

---

# চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

এই সময়ে কমলাকান্ত কিছু জোত জমির সংস্থান করিয়াছিলেন। তাঁহার মাতা পুত্রের বিবাহ দেওয়া উচিত মনে করিয়া নানাস্থানে চেষ্টা করিলেন কিন্তু কোথায়ও পুত্রের সম্বন্ধ ঘটনা হইলনা। তজ্জন্য সর্ব্বদা দুঃখিত থাকেন। কমলাকান্ত মাতার বিষাদ ভাব দেখিয়া সময়ে সময়ে বিধাতার ইচ্ছা নহে ইহাই বলিয়া মাতাকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন।

কমলাকান্তের এত যে অভাব জনিত কষ্ট তথাপি খবরের কাগজ ও নূতন নূতন পুস্তক দেখিতে ক্রটী করিতেন না। এমন কি স্থানে স্থানে ভ্রমণ করিয়াও ভাল ভাল পুস্তক পড়িতেন। ইহাতে তাঁহার রচণায় রুচি-শক্তি একটুকু হইয়াছিল। "স্কুলত" কখনই দেখেন নাই নিজের রুচিপ্রবলতার বশবর্ত্তী হইয়াই "সরিৎ-কুমার" নামে একখানি উপন্যাস গ্রন্থ রচনা করেন এবং বহুকষ্টে মুদ্রাঙ্কন কার্য্য সম্পন্ন করিয়া জন সমাজে প্রচার করেন। এতদ্ভিন্ন, "গুহগণ পতির দ্বন্দ, মনের প্রতি উপদেশ, রিপু সংযম" প্রভৃতি অনেকগুলি পুস্তক লিখিয়া ছিলেন। অর্থাভাবে সেই সকল গ্রন্থ প্রকাশ করিতে পারেন নাই। এক্ষণে বহু অন্বেষণেও তাহা আর পাওয়া গেল না। যাহা হউক তাঁহার বিদ্যোৎসাহ অল্প বয়স হইতেই ছিল। নানাপ্রকার বিড়ম্বনায় তিনি কখনও কর্ত্তব্য কার্য্যের প্রতি উদাসী ছিলেন না। আত্মোন্নতির

প্রতি প্রীতি ও অনুরাগ নিবন্ধন ভালই হউক আর মন্দই হউক, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা রচনা করিতেন। এখানে তাঁহার একটী নমুনা দেখুন :—

শশী কলঙ্ক ভূষিত কিংবিধ রাহুগ্রাসেন লাঞ্ছিত।
সিন্ধু লবণ দূষিত কিংবিধ প্রাণী পানেন বঞ্চিত।
চন্দ্রে পীযূষ ক্ষরিত বারিধ যথা রত্নেন রঞ্জিত।
ধীরা প্রশস্ত হৃদয়ে মহত্ব তত্ত্ব ভাবেন বাঞ্ছিত।

এই কবিতাটীতে অবশ্য ব্যাকরণ দোষ বা ভাব দোষ ক্রিয়া দোষ থাকিতে পারে, কারণ, কমলাকান্ত কখনও সংস্কৃত পড়েন নাই। পণ্ডিত গণের মুখে ছন্দ ভাবগুলি শুনিয়া তাঁহার প্রাণের আকাঙ্খা যে এতদূর প্রবল ছিল উহাই আলোচ্য।

কমলাকান্ত যৌবনকালে বড় তর্কপ্রিয় ছিলেন। তখন তিনি জানিতেন না যে তর্কের দ্বারা জ্ঞান শিক্ষা নীতি বিরুদ্ধ। এজন্য অনেকে তাঁহাকে উদ্ধত কলহপ্রিয় বলিয়া উপহাস করিতেন। কিন্তু বয়ো-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই সে রোগটা কিছু কিছু যেন উপশম হইতে লাগিল। তর্ক ভাবটী অনেক কমিয়া গেল। একদিন কোনও স্থানে এক জন শাস্ত্র ব্যবসায়ী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সহিত সাক্ষাৎ হয়। তাঁহাকে অতি বিনীত নম্র ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, ঠাকুর মহাশয়! আকাশে যে চন্দ্র সূর্য্যকে রাহুতে গ্রাস করে উহাকি বস্তুতঃই সত্য? পণ্ডিত ঠাকুর হাসিয়া বলিলেন "বাপুরে! তুমি ছেলে মানুষ, পুরাণাদি ত কখনও পড় নাই, ও কথা কি কখনও মিথ্যা হয়,সমুদ্র মন্থনে অমৃতভাণ্ড উঠিয়াছিল" ইত্যাদি অনেক বলিয়া বেশ বুঝাইলেন। কমলাকান্ত করযোড়ে অবনত শিরে আবার বলিলেন, "ঠাকুর মহাশয়! শুনিতে পাই, পৃথিবীর ছায়া গ্রহ দুইটীতে পড়িলে ঐ রূপ দেখা যায়। চন্দ্র সূর্য্যত কল্পনার ছবি নহে।"

উহা বস্তুতঃ প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড এক একটা গ্রহ। পৃথিবী হইতে সূর্য্য যে কত বড় কে বলিতে পারে?” পণ্ডিত মহাশয় কিছুকাল মৌনভাবে থাকিয়া বলিলেন, “বাপুরে! তোমার কথাটাই যেন ঠিক বোধ হইতেছে। কেননা শাস্ত্রে সৌর জগৎ লেখা আছে। একটী সূর্য্য অসংখ্য জগৎকে আলোক প্রদান করিতেছে, তাহাকে ক্ষুদ্র একটা রাহুতে গ্রাস করিবে কেমন করিয়া—বাস্তবিকই একটুকু ভাবিবারই ত কথা! তুমি যে কথাটা বলিয়াছ তাহা কিছুতেই ফেলিবার নহে। বাবা! ক্ষুদ্র হইতেও যে জ্ঞান লাভ হয় এ কথা ধ্রুব সত্য। আমার বহুদিনের ধাঁধাটিকে আজ আবার একটা বড় ধাঁধায় গ্রাস করিল।” কমলাকান্ত বলিলেন, “তবে আপনাকেও কি ধাঁধা রাহুতে ধরিল।” কমলাকান্তের কথাটা শুনিয়া পণ্ডিত ঠাকুর আনন্দ সহকারে তাঁহাকে “চিরজীবি হও” বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন।

পাঠক! কমলাকান্তের ভয়ানক বিপদের বৎসর উপস্থিত। ১২৮১ সাল কি তাঁহার হৃদয় বিদারক শোক সন্তাপ লইয়া আসিল। বৈশাখ মাস হিন্দুজাতির দেব দেবীর পূজা অর্চ্চনায় বড় বিশ্বাস। সুতরাং এই শুভমাসে ধর্ম্মোৎসব জনিত সকলেই আনন্দভোগ করেন। কিন্তু কমলাকান্তের পক্ষে বিষম বিপদের বৎসর হইয়া উঠিল। বৈশাখের ২৭শে তারিখ মধ্যাহ্নকালে কমলাকান্তের মাতা হঠাৎ ওলাউঠা পীড়ায় আক্রান্ত হন। ক্রমে ক্রমে সেই অনিবার্য্য ভীষণ ব্যাধি প্রবল হইতে লাগিল। সে সময়ে এ প্রদেশে সুচিকিৎসক বা ডাক্তার ছিলেন না, তথাপি কমলাকান্ত আয়ুর্ব্বেদ মতে অনেক চেষ্টা করিলেন,কিন্তু কিছুতেই ঐ ভয়ঙ্কর ব্যাধির উপশম হইল না। ঈদৃশ ভীষণ যন্ত্রণার মধ্যেও উমা-সুন্দরী পুত্রকে ডাকিয়া নানাপ্রকার উপদেশ দিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে ক্ষণকালের জন্যও তাঁহার জ্ঞানের ব্যত্যয় বা জিহ্বা আড়ষ্ট হইল না। স্পষ্টরূপে আপন অভীষ্ট দেবতার নাম করিতে লাগিলেন। এক

মুহূর্ত্তের জন্যও কাহাকে কোনও কষ্ট দেন নাই। রাত্রি ৯টার সময় পুত্রকে বলিলেন, "এখানে তোমার ত আপনার বলিবার কেহ নাই, সাবধানে থেকো, আমার সময় ফুরিয়ে এল, তুমি আকুল হইও না। তোমাকে রেখে আমার যাওয়াই মঙ্গল।" দেখিতে দেখিতে তাঁহার শরীর অবসন্ন হইয়া পড়িল। তখনও অতি ক্ষীণ স্বরে আরাধ্য দেবতার নাম করিতে লাগিলেন। অল্পক্ষণ মধ্যেই উজ্জ্বল চক্ষু নিষ্প্রভ ও স্তিমিত হইল—মহাপ্রাণে মিশিয়া গেলেন। কমলাকান্ত বন্ধুগণ লইয়া তাঁহার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন।

একদিন গ্রামে কোনও ব্রাহ্মণ বাটীতে রাঢ় দেশীয় বামাচার ধর্ম্মাবলম্বী জনৈক ভট্টাচার্য্য আসিলেন। কমলাকান্তের পরিচিত রায়-চৌধুরীর কর্ম্মচারী সীতানাথ রায় ঐ ভট্টাচার্য্যের সহিত বড় মেশামিশি করিলেন। কমলাকান্ত ও ঝাঁপড়দহ নিবাসী নন্দলাল পাল এবং এক-জন ব্রাহ্মণ, এই চারি জনে ভট্টাচার্য্যের সহিত যোগ দিলেন। কৌল-ধর্ম্ম মহাস্রোত বর্ষ ভেদ করিয়া চলিতে লাগিল। বিশ্বপতির বিশ্ব লীলার গূঢ় রহস্য কে বুঝিতে পারে। ইহার ভিতরেও মঙ্গল সামঞ্জস্য রহিয়াছে। কাঞ্চনতলার নিকটবর্ত্তী ধুলিয়ানে একটী মাইনর স্কুল ছিল। ঐ স্কুলে সুখময় হালদার নামে একজন কায়স্থ জাতীয় হেডমাষ্টার ছিলেন। এই বামাচার ধর্ম্মের ভীষণ তরঙ্গ মধ্যে সুখময় বাবুর শ্বশুর পরমেশ্বর বসু মল্লিক মহোদয় হঠাৎ ধুলিয়ানে উপস্থিত হন। এখানে তিনি পূর্ব্বেও একবার আসিয়াছিলেন। নন্দবাবুর সহিত ইহাঁর বেশ ঘনিষ্ঠতা ছিল। কিন্তু এ যাত্রায় তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া তাদৃশী তৃপ্তি পান নাই। তথাপি পূর্ব্বানুরাগের বশবর্ত্তী হইয়া সর্ব্বদা তাঁহার নিকট যাইতেন।

পরমেশ্বর মল্লিকের সহিত কমলাকান্তের আলাপ হইল। প্রায় প্রতি-দিনই ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় তর্ক বিতর্ক চলিতে লাগিল। মল্লিক মহাশয় নববিধান সমাজের কতকগুলি মত প্রাঞ্জলভাবে বলিতে আরম্ভ করিলেন।

তিনি সাকারবাদের দুর্গম পথ বিশদরূপে ব্যাখ্যা করিয়া পরব্রহ্মের উপাসনা দ্বারা অনেকেরই হৃদয় আকর্ষণ করিলেন। এমন কি এক-দিনও আলোচনা বন্ধ থাকে না। সকলেই বেলা ৩টার সময় উপস্থিত হন। কিন্তু কমলাকান্ত ও নন্দবাবু উভয়েই সন্ধিস্থলে পড়িলেন। ধর্ম্মের অনুরাগ আছে সত্য, অথচ কোন্ দিক অবলম্বন করিবেন কিছুই স্থির করিতে পারেন না। কমলাকান্ত দিবসে তাঁহার সহিত তর্ক বিতর্ক করিয়া আইসেন বটে ফলতঃ বাড়ীতে একাকী ঐ সকল বিষয়েরই চিন্তা করিতে থাকেন। মল্লিক মহাশয় সাকারবাদের বিরুদ্ধে যে সকল কথা বলিতেছেন তাহাও ত নিতান্ত অসার বলিয়া বোধ হয় না। আর এটিও বেশ বুঝা যাইতেছে, প্রতিমা নির্ম্মাণ দ্বারা যে পূজা করা হয় ধ্যানেও ত ঐ প্রতিকৃতি দেখা যায়। একদিনও ত নির্ম্মিতরূপের ব্যত্যয় হয় না। বাহিরের গড়ান মূর্ত্তিই ত ভিতরে দর্শন হয়। যাহা হউক, এ সকল কথা যখন প্রাণে উঠিতেছে তখন না বুঝিয়া সহসা কিছু বলা কর্ত্তব্য নহে। "ভাল দেখাই কেন যাক্ না" এইরূপ অনেক প্রকার চিন্তা করিতে করিতে বড় ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। এ যাত্রায় মল্লিক মহাশয় বেশী দিন থাকিলেন না। শীঘ্রই হরিদ্বার চলিয়া গেলেন।

কমলাকান্ত ধর্ম্মের সার তত্ত্ব অন্বেষণ জন্য তান্ত্রিক ও বেদবিৎ পণ্ডিতগণের নিকট উপস্থিত হইয়া প্রশ্নোত্থাপন করেন। তাঁহাদের গভীর উপদেশে ইতস্ততঃ ভাব আরও যেন প্রবল হইতে লাগিল। আবার ইহাও ভাবেন যে এই পৃথিবীতে অধিকাংশ ব্যক্তিই যখন সাকার পূজার প্রতি অনুরক্ত এবং মনীষীগণ সাকার পূজার দ্বারা সিদ্ধ হইয়াছেন, তখন ইহা যে একেবারে কিছুই নয় এটাও ত সম্ভব নহে। বাস্তবিকই ধর্ম্মের পথ "ক্ষুরধার স্বরূপ"। ইহাতে গতিস্থিতি অতি সাধু প্রকৃতির উপর নির্ভর করে। এইরূপ বিবিধ চিন্তায় আকুল হইয়া নানাস্থানে ভ্রমণ করেন, কিন্তু কোথাও শান্তি পান নাই।

কিছুদিন পরে ধুলিয়ানে মল্লিক মহাশয় উপস্থিত হইলেন। এই সময়ে কাঞ্চনতলার জমিদার জগদ্বন্ধু রায় চৌধুরীর জামাতা গঙ্গাচরণ ঘোষও তাঁহার সহিত যোগ দিতে লাগিলেন। মল্লিক মহাশয়ের নিকট অধিকাংশ সময়ই সুখময়বাবু ও নন্দবাবু ধর্ম্মালোচনা করেন। সুতরাং তাঁহারা একেশ্বরবাদ ধর্ম্মের কিছু কিছু তত্ত্ব পাইয়াছিলেন। কমলা-কান্তের ধর্ম্মবন্ধু নন্দবাবুর ধর্ম্মমত ফিরিয়া যায়। কমলাকান্ত তাঁহার কৌলবন্ধুর অবস্থার পরিবর্ত্তন দেখিয়া বলিতে লাগিলেন হায়! এত শীঘ্র যে ডাক্তার বাবুর এরূপ অবস্থান্তর হইবে, বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়।

অস্থি মজ্জাগত বিশ্বাস সহসাই যে চলিয়া যাইবে কখনই সম্ভব নহে। বিশেষতঃ বহুদেববাদ ধর্ম্ম ইহাও ত শাস্ত্রানুমোদিত। আবার ইহাও সম্ভব যে যখন ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল তত্ত্ব "একমেবা দ্বিতীয়ম্" তখন বহু দেব দেবীর পূজা বড়ই চিন্তার কথা। কমলাকান্ত দিবসে নন্দবাবু, সুখময় হালদার, মল্লিক মহাশয়দিগের সহিত আলোচনা করেন, কিন্তু বাড়ীতে আসিয়া প্রায় সমস্ত রাত্রি চিন্তাতরঙ্গে ভাসিতে থাকেন। ভয়ানক ইতস্ততঃ ভাবনায় তাঁহার চিত্তকে আকুল করিয়া তুলিল। বামাচার ধর্ম্মের বন্ধু তিনটীর মধ্যে একটীর মত পরিবর্ত্তন হইল ইহাও যন্ত্রণার কারণ। সুতরাং বিবিধ চিন্তায় বড় আকুল হইয়া পড়িলেন।

মল্লিক মহোদয় কমলাকান্তের ভাব গতিক বুঝিয়া একদিন সকলের সমক্ষে বলিলেন, "দেখুন! একটী বিষয়ে বড়ই অসুবিধা মনে হয়। আপনারা যখন সকলে আগ্রহ সহকারে ব্রাহ্মধর্ম্মের আলোচনা করিতে-ছেন, তখন একটী সমিতি স্থাপন করিলে কি ভাল হয় না? গঙ্গাচরণ বাবু, সুখময়বাবু, নন্দবাবু ইহাঁরা সকলে "বেশ, বেশ, ভালই ত!" এই বলিয়া অনুরাগের সহিত তাঁহার কথায় সম্মত হইলেন। ঐ সময় আরও একটী বিষয়ের সুবিধা হইয়া গেল। মল্লিক মহাশয়ের সঙ্গে দুই ভাগ ভক্তিচৈতন্যচন্দ্রিকা পুস্তক ছিল। তাহাই কেবল পাঠ

হইত। আবার "ভারত বিধান" দুই ভাগ, "ব্রাহ্মধর্ম্মের ইতিবৃত্ত" এক-খানি, এ সকলও আনিবার জন্য তখনই পত্র লেখা হইল। অল্পদিন মধ্যেই মল্লিক মহাশয়ের পুত্র শশীবাবু ঢাকা হইতে পুস্তক কয়খানি পাঠাইয়া দিলেন।

গঙ্গাচরণ বাবু এক এক দিন এক এক খানি পুস্তক পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন। প্রায় সকলেই ঐ সকল গ্রন্থের আকর্ষণী শক্তিতে মুগ্ধ হইয়া পড়িলেন। ফলতঃ কমলাকান্ত ইতস্ততঃ ভাবটী ছাড়িতে পারিলেন না। বহুদর্শী, প্রাচীন ঋষিগণ সকলেই ত সাকার পূজার বিধান পদ্ধতির অনুবর্ত্তী হন, এইটী তাঁহার মুখে বেশ বাধিয়া ছিল। আর "ভক্তিচৈতন্যচন্দ্রিকা, ভারত-বিধান, ব্রাহ্মধর্ম্মের ইতিবৃত্ত" শুনিতেও প্রাণ একটু ভিজা ভিজা হয়। ব্রাহ্মধর্ম্মের আলোচনায় যোগ দিতেও ছাড়েন না।

যাহা হউক এখানে পরমেশ্বর মল্লিক মহাশয়ের অবস্থার বিষয় একটু বলা আবশ্যক। ইনি হাওড়ার অন্তর্গত শালিখায় কোন আফিসে কোন কার্য্য করিতেন। তহবিল অর্থাৎ রোকড় ক্যাসের গোলমাল বশতঃ ফেরারী হন। ইহাঁর পুত্রের দ্বারা জীবনের পরিবর্ত্তন সূত্রপাত হয়।* এখানে এই ধুলিয়ানই যে পাপীর পাঠশালা—ইহা অত্যুক্তির কথা নহে। পাঁচটী পাপী লইয়া ভগবান যে কি অনির্ব্বচনীয় লীলা করিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ করিলেও অবাক্ হইতে হয়। গঙ্গাচরণ বাবুও ব্রাহ্মধর্ম্মের একজন প্রধান মতাবলম্বী হইয়া উঠিলেন। তাঁহার মুখে সর্ব্বদা "দে মা পাগল ক'রে" এই গানটী থামিত না। কমলাকান্তই কি ত্রিশঙ্কুর মতে থাকিবেন ? তাহাও ত সম্ভব নহে ! কালে যে ধরিয়াছে, আর যাবেন কোথায় ! ঘোর অন্ধকারে, বিদ্যুৎ জ্যোতিতে পথ দেখায়,

* "পাপীর জীবনে ভগবানের লীলা" গ্রন্থে বিস্তৃতভাবে বর্ণিত আছে। একবার পাঠ করিলে সকল জানিতে পারিবেন।

ভীষণ উত্তাপের চরম অবস্থাতেই বারি বর্ষণ হইয়া প্রাণ শীতল করে। পাপের প্রাদুর্ভাব প্রবল হইলে শান্তির পবিত্রতা লাভ হয়। এই সংঘর্ষণে কমলাকান্তের হৃদয়ে সাকার-উপাসনার ভাবটা কতক কমিয়া গেল। একদিন মল্লিক বাবুকে বলিলেন, তবে সমিতি স্থাপিত হউক না কেন! মল্লিক মহাশয় তাঁহার ঐরূপ কথায় বড় আহ্লাদিত হইয়া বলিলেন, আজই কেন হউক না! সকলেই সন্তোষের সহিত ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন।

১২৯০ সালের ১৪ই কার্ত্তিক সুখময় হালদারের বাসা বাড়ীতে সমিতি বসিল। উপাসনা, আরাধনা, প্রার্থনা প্রভৃতি উৎসাহের সহিত চলিতে লাগিল। পরমেশ্বর মল্লিক মহাশয় বড় ভাল ভাল ব্রহ্ম-সঙ্গীত গাহিতেন, এবং গানের সহিত যোগ দিয়া নিজেই মৃদঙ্গ বাজাইতেন, উপাসকের কার্য্যও করিতেন। সাপ্তাহিক উপাসনার দিন রবিবার নির্দ্ধারিত হইল কিন্তু গঙ্গাচরণ বাবুর তাহাতে তৃপ্তি হইল না। বুধবারে আর একটী দিনও স্থির হইয়া গেল, এক সপ্তাহের মধ্যে দুই দিবস সমিতি; এতদ্ভিন্ন নিজ নিজ দৈনিক উপাসনা, প্রতিদিন বৈকালে গ্রন্থপাঠ, আলোচনার ত কথাই নাই; ইহাতে উপাসক মণ্ডলী প্রত্যেকেরই যেন একটুকু প্রেমের ভাব দেখা দিল। এই সমিতির কথা শুনিয়া সকল শ্রেণীর লোক উৎফুল্ল হইয়া আসিতে আরম্ভ করিলেন মাঝে মাঝে হাট বারে ধুলিয়ান বন্দরে কীর্ত্তন বাহির হইত। তাহাতে অনেকেই যোগ দিতেন ফলতঃ ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য প্রভৃতি উচ্চ বংশীয়েরা একটু তীব্র চক্ষে দেখিতে লাগিলেন। বিশেষতঃ কাঞ্চনতলার ভদ্রমণ্ডলীর কেহ কেহ স্পষ্টভাবেই ব্রাহ্মধর্ম্মের ঘোর প্রতিবাদ আরম্ভ করিলেন। কেহবা "বিষ কুম্ভ পয়ো মুখ" এমন ভাবেও সমিতির মূল-চ্ছেদ জন্য উদ্যোগী হইলেন। কখন কখন দুই এক জন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত আসিয়া পুরাণাদি বিবিধ শাস্ত্রের প্রমাণ প্রয়োগ দ্বারা ভীষণ তর্ক

সংগ্রামে প্রবৃত্ত হন। ঈশ্বরের মহিয়সী শক্তি প্রভাবে সমিতির সভ্যেরা পরাভূত হন না, বরং উহাতে তাঁহাদের ব্রহ্মানুরাগের অনুকূল পথই পরিষ্কার হইতে লাগিল। বিরুদ্ধাচারিগণ যতই তর্কের অগ্নি প্রজ্বলিত করেন, সমিতির প্রবর্ত্তকদের ততই শান্তির বিমল অমিয়া ধারা ছুটিতে থাকে।

একদিন রবিবার সাপ্তাহিক সমিতির উপাসনায় স্থির হইল এখন হইতেই অল্পই হউক বা বেশীই হউক পরস্পর প্রার্থনা করা উচিত। এই কথা শুনিয়া সুখময় হালদার প্রথমতঃ প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু বিবিধ প্রকার কথা সন্নিবেশিত করাতে বিস্তৃত হইয়া পড়িল। তাঁহার পরে কমলাকান্ত "দয়াময়" ইহা ভিন্ন আর কিছুই বলিতে পারিলেন না। গঙ্গাচরণ বাবু ও নন্দবাবুর আদবেই মুখ খুলিল না। যাহা হউক ঐ কার্য্যটীতে বড় সুবিধা হইল। ঐ দিন হইতে সকলেরই দৈনিক উপাসনার প্রতি একটু বেশী ঝোঁক পড়িল।

ঐ দিন হইতে কমলাকান্ত ত্রৈকালীন উপাসনা আরম্ভ করিলেন। একদিন বাড়ীতে মধ্যাহ্নের উপাসনার পর একটু ধ্যানের চেষ্টা করিতেছিলেন, সেই সময় সহসা তাঁহার হৃদয় হইতে যে সঙ্গীতটী প্রকাশ হয় তাহা এই—

সুরট-মল্লার—একতালা।

জীব নব যন্ত্র ধর করে।

নিদান বিধান, ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞান, বাজে যাতে তারে তারে।
মিলাইয়া মনে, ধ্যান লয় যোগে, ব্রহ্মগুণ গান কর প্রেম রাগে,
জাগাও বিবেকে ভক্তি অনুরাগে, সত্য সুধাময় স্বরে।
এ যন্ত্রে অনন্ত রাগের সৃজন, ব্রহ্মরূপ হৃদে পায় দরশন,
রাগ হিংসা-দ্বেষ হয় বিসর্জ্জন, ভ্রান্তি নাশে শান্তি গুণে;—
আসক্তি ভাবনা বিলাস বাসনা, ইহাতে ঘুচে সকল যন্ত্রণা,
মায়া প্রলোভিনীর হয় বিড়ম্বনা, যদি প্রেমে বাদ্য করে।

বৈকালে কমলাকান্ত ও গঙ্গাচরণ ঘোষ উভয়েই ধুলিয়ানে সুখময় তালদারের বাসায় গেলেন। অনেক কথাবার্ত্তার পর ঘোষবাবু বলিলেন মহাশয়, ঐ সঙ্গীতটী দিন না? কমলাকান্ত মল্লিক মহাশয়কে তাঁহার রচিত সঙ্গীতটী দিলেন। তিনি গীতটী একবার গাহিয়া বড় আগ্রহের সহিত নিজের কাছে রাখিলেন।

গঙ্গাচরণ ঘোষ প্রতিদিনই কমলাকান্তের বাড়ীতে অধিক সময় থাকিতেন। ইহাঁরা উভয়েই গ্রামবাসীর সামাজিক শাসন ব্যবহার ও ধর্ম্মসম্বন্ধীয় নানা বিষয়ের আলোচনা করেন। একদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে সামাজিক বিষয়েরই কথাবার্ত্তা চলিতেছিল, এমন সময়ে পরমেশ্বর মল্লিক ও নন্দলাল পাল ডাক্তার, প্রান্তর-বায়ু সেবন করিতে করিতে কমলাকান্তের বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। গ্রামস্থ ভদ্রমণ্ডলীর কড়াকড়ি সামাজিকতার ব্যবস্থা সকল আনুপূর্ব্বিক অবগত হইয়া, হাসিতে লাগিলেন। সান্ধ্যোপাসনার সময় সমুপস্থিত দেখিয়া কমলাকান্ত বলিলেন, এখন ঐ সকল কথা ছাড়ুন। উপাসনার যোগাড় করা যাক্। গঙ্গাচরণ বাবু বলিলেন, "কোথায়?"

নন্দবাবু। এইখানেই কেন উপাসনা হউক না? দৈনিক উপাসনা ত সর্ব্বত্রই হইতে পারে?

কমলাকান্ত। এখানে উপাসনার বিঘ্ন হইবার সম্ভব। গ্রামের অস্থির প্রকৃতির লোক আসিয়া গোলমাল করিতে পারে।

গঙ্গাচরণ বাবু। তবে কোথায় যাওয়া যায় বলুন। আমার বাড়ীতেও যে বড় অশান্তির ব্যাপার।

মল্লিকবাবু। উপাসনা ত বন্ধ থাকিবে না। একটু নির্জ্জন স্থান কি কোথাও নাই? মাঠ ত আছে?

কমলাকান্ত। (একখানি মাদুর বগলে করিয়া) তবে সকলেই উঠুন। আর বিলম্ব কেন?

কমলাকান্তের বাড়ীর পশ্চিমদিকে আন্দাজ ২।৩ রশি ব্যবধানে দোল গোবিন্দ দাসের একখানি বাঁশের বাগান আছে। ঐ বাঁশ বাগানে সকলেই উপস্থিত হইলেন। একটু পরিষ্কার স্থানে মাদুর পাতিয়া তাহারই উপর উপাসনা আরম্ভ হইল। মল্লিক মহাশয় প্রথমতঃ মধ্যম স্বরে একটী সঙ্গীত করিয়া উপাসনা আরম্ভ করিলেন। ঐ দিনে সাধারণ প্রার্থনার সময় কমলাকান্তের লোক-সঙ্কট-সঙ্কীর্ণতা-ভাব অনেক উপশমিত হইল। তিনি তখনই অত্যন্ত ব্যাকুলভাবে সকলের সম্মুখে একটী প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা করেন। গঙ্গাচরণ বাবুও অবস্থোচিত অতি সরল ভাষায় সুন্দর প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু সেদিন নন্দবাবুর মুখ খুলিল না। উপাসনার পর সকলে আপনাপন স্থানে চলিয়া গেলেন। এইভাবে উৎসাহ উদ্যমের সহিত দিন চলিয়া গেল। কিন্তু মাঝে মাঝে এক একটী বড় আশ্চর্য্যের ব্যাপার উপস্থিত হয়, ইহার মূল কারণ কেহই ধরিতে পারে না। ঢাকা হইতে মল্লিক মহাশয়ের পুত্র শশিভূষণ মল্লিক যখনই তাঁহার পিতাকে পত্র লিখেন তখনই তিনি অনুতপ্ত হৃদয়ে দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া এইমাত্র বলিতেন, "হায়, কি হইল।" একবার পত্র আসিল—তামাক পরিত্যাগ করিলেন। আর একখানি পত্র একটু দীর্ঘ রকমের পৌছিল—সেবারে আফিংটী ছুটিল। মৎস্য, মাংস প্রথমেই ছাড়িয়া দিয়াছেন, ক্রমে ক্রমে উত্তম উপাদেয় বস্তুতেও অস্পৃহ ভাব প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। শেষে আর একখানি চিঠি আসিল—সেদিন হঠাৎ বলিয়াছিলেন, "আমার পরীক্ষার সময় উপস্থিত! আর আমি এখানে থাকিতেছি না।" ফলতঃ সেদিন বিষম যন্ত্রণাগ্রস্ত রোগীর ন্যায় থাকিলেন। পরদিন ৮ই মাঘ প্রত্যুষেই কলিকাতায় গমন করিলেন।

কমলাকান্ত বামাচার ধর্ম্ম আলোচনার সময়েও বন্ধুভাবে চারিজনে ছিলেন। এই ব্রাহ্মধর্ম্মেও চারিজনে সম্মিলিত হইলেন। সমিতির

কার্য্য চলিতে লাগিল। ব্রহ্মানুষ্ঠানের ভিতরে সকলেরই প্রাণ ডুবিয়া গেল; ক্ষণকালের জন্যও বিরাম নাই; কিন্তু সাধু কার্য্যে অনেক বিঘ্ন বিড়ম্বনা উপস্থিত হয়। একদিন জমিদার জগদ্বন্ধু রায় চৌধুরী মহাশয়কে কোনও ব্যক্তি তাঁহার জামাতার ব্রাহ্মধর্ম্ম যাজন সম্বন্ধীয় নানা কথায় বড় উত্তেজিত করেন। তিনি গ্রামের প্রধান প্রধান ভদ্রলোক এবং শ্রীনাথ রায় চৌধুরীকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ওরা সব কি করে?" ইতিপূর্ব্বে শ্রীনাথ বাবু বহু তর্ক বিতর্কের পর ভাবটা বেশ বুঝিয়াছিলেন, তিনি সকল কথা প্রাঞ্জলভাবে বুঝাইয়া দিলেন। রায় চৌধুরী মহাশয় এইমাত্র উত্তর দেন যে "তবেত ওরা ভাল কাজ করে।" গঙ্গাচরণ বাবু শ্বশুরের অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া আহ্লাদিত হইলেন। তখন হইতে "দে মা পাগল করে" আরও কিছু ঘন ঘন চলিল। মেঘ-বৃষ্টি গ্রীষ্মোত্তাপ কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ নাই; যেন প্রেমে উন্মত্ত।

১২৯১ সাল উপস্থিত হইল। এই বৎসরের প্রথম হইতেই কমলা-কান্তের স্বাভাবিক ভাবে ধর্ম্মব্রত প্রচার সাধনে প্রবৃত্তি জন্মে।' তখন তাঁহার বয়ঃক্রম ৪৮ বৎসর। সেই সময়ে ধর্ম্ম ভাব প্রাণে বড়ই জাগিয়া উঠে। চারিটী ধর্ম্মবন্ধু এক হৃদয় হইয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের অক্ষয় বীজ এই প্রদেশে ছড়াইতে লাগিলেন। একেশ্বর বাদের মহাস্রোত যতই প্রবল বেগে বহিতে লাগিল, সাকারবাদীদিগের বিদ্বেষানল ততই যেন জ্বলিয়া উঠিল। কাঞ্চনতলা গ্রামের ভদ্রমণ্ডলীর মধ্যে কতকগুলি লোক কমলাকান্ত ও গঙ্গাচরণ ঘোষের প্রতি আহার সম্বন্ধীয় দোষক্ষেপণ করিয়া তাঁহাদিগকে বদ্ধ রাখিবার জন্য ষড়জাল বিস্তার করিলেন। এবং তাঁহারা একটী বিশেষ সুবিধা পাইয়া শাসন কার্য্যটা একটু বাড়াবাড়ি রকম চালাইলেন।

---

## পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

গ্রামবাসীর মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তিই পূর্ব্বোক্ত কারণে অত্যন্ত চটিয়া গেলেন। কমলাকান্তের প্রতি সামাজিক শাসন আরম্ভ হইল। তিনি যখন যে বিষয় উপস্থিত হয় একবারে ছাড়িয়া দেন। ধোপা বন্ধের কথা শুনিলেন, গৈরিক বস্ত্র ব্যবহার করিলেন। নাপিত ক্ষৌর করিবে না, দাড়ি গোঁফ একবারে রাখিয়া দিলেন। সাকার পূজায় যখন যোগ দেওয়াই নিষেধ তখন নিমন্ত্রণের ত কোন কথাই নাই। শেষের কথাটা—ডোম ত একজন ভাই বটে, আর কিসে আঁটিয়া রাখিবেন। বুঝিতে গেলে সমাজই বন্ধ রহিল।

এইরূপ নানাবিধ সামাজিক শাসন দ্বারা কমলাকান্তকে তাঁহার আত্মীয়গণ কিছুতেই আঁটিতে পারিলেন না। তিনি ঐ সকল ব্যাপারে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া সত্য কি ইহারই চিন্তায় অত্যন্ত ব্যস্ত থাকিতেন। এই সময় তাঁহার অন্তঃকরণে অশেষ প্রকার সন্দেহের বেগ প্রবল হইয়া উঠিল। তন্ত্রলব্ধ মূর্ত্তি পূজার কুলধর্ম্মটী হৃদয়ে দৃঢ়রূপে রহিয়াছে, তাহার উপর আর একটী ধর্ম্মের বোঝা আপনা হইতেই আসিল, সুতরাং বড়ই অস্থির হইয়া পড়িলেন। একদিকে চিরবিশ্বাসের মূলচ্ছেদন করা, অপরদিকে জীবন্ত সত্যধর্ম্মের অনুরাগ প্রবল, এই উভয়-সন্ধি মধ্যে পড়িয়া কেনই বা তিনি স্থির হইতে পারিবেন। তিনি নদী বা পুষ্করিণী যখন যেস্থানে স্নান করিতে যাইতেন, আসিবার সময়টুকু মধ্যে তখনই পথে পথে কর জপ দ্বারা পূজাটা সারিয়া ফেলিতেন। বাড়ীতে রীতিমত উপাসনা, আরাধনা, প্রার্থনা চলিত। অথচ এইরূপ ইতস্ততঃ বিশ্বাসের বেগ কিছুতেই নিবৃত্ত হয় না। ঈদৃশ ভীষণ সন্দেহের বশবর্ত্তী হওয়াতে তাঁহার অশান্তি যাতনা বাড়িতে লাগিল। যদিও সাকার পূজার প্রতি

একটুকু সন্দেহ হইয়াছিল, তথাপি পথে পথে কর জপ করা কিছুতেই ছাড়িতে পারেন না। উক্তরূপ কর জপ করা সম্বন্ধে তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে একেবারে কুলধর্ম্ম পরিত্যাগ করা উচিত নয়। ইহা থাকিলেই বা দোষ কি? যদি কিছু সারতত্ত্ব উহার ভিতরেও থাকে তবে তাহাই বা ছাড়িয়া দেওয়া কেন? আর না থাকিলেই বা ক্ষতি কি? একটুকু জপ করা বই ত নয়। এইরূপে হৃদয়কে প্রবোধ দেন বটে, কিন্তু একেশ্বর বাদ ধর্ম্মের অনুরাগ প্রবল হইতে আরম্ভ করিল। দুইটী বিষয়ের সংঘর্ষণে একটী শক্তি হীন হইয়া পড়ে, ইহা স্বাভাবিক। কমলাকান্তের তন্ত্রলব্ধ ধর্ম্ম বিশ্বাস ক্রমে ক্রমে কমিতে লাগিল। একদিন মধ্যাহ্নকালে উপাসনায় বসিয়াছেন সহসা তাঁহার হৃদয়ে কে যেন এই কথাটী বলিলেন, "রে মূর্খ! ভ্রান্তির অন্ধকারে কেন ভ্রমিতেছিস্? দুয়ের ভিতরে প্রকৃত সত্যকে আশ্রয় কর্।" কললাকান্ত তখনই আবার প্রার্থনা করিলেন, "হে পাপীর পরিত্রাতা! আমি ত কিছুই জানি না। হৃদয়ের ভিতর কেন যে এইরূপ কথা হয়, তুমিই বল! কোন্ দিক ধরিব?" আবার কথা আসিল, "এই উপাসনায় যে ধর্ম্ম য়াজন করিতেছ, ইহাই সত্য। পিতা মাতা সদ্‌গুরু "আমি"। এখনই লিখন সামগ্রী লইয়া আইস।" কমলাকান্ত তখনই দোয়াত, কলম, কাগজ সংগ্রহ করিয়া আবার বসিলেন। কে যেন তাঁহার হৃদয়ে মধুর স্বরে বলিতে লাগিলেন, তিনি লিখিতে আরম্ভ করিলেন। কথাগুলি এই—

বেদ মাতা নিরাকারা নিত্য সত্য স্বরূপিণী।
ত্বং হি মা ভুবনারাধ্যা সর্ব্ব ভূত প্রসবিণী॥
জগদ্ধাত্রী জগৎ কর্ত্রী জ্ঞান দাত্রী সনাতনী।
নাদ ব্রহ্মময়ী রূপা ভাব বিকাশ কারিণী॥

অঘ মুগ্ধ বিমূঢ়স্য সদা মঙ্গল দায়িনী।
অসত্যং জীবনাধারে তত্ত্ব জ্ঞান বিধায়িনী॥
উজ্জ্বল বিমল ভাতি ধর্ম্ম বর্ত্ম প্রদর্শিনী।
বিবেক ভক্তি বৈরাগ্য ভক্ত চিত্তে প্রদায়িনী॥
হৃদয়ে ধ্বান্ত মধ্যেতু শান্তি জ্যোতিঃ প্রকাশিণী।
কল্পনা জল্পনা ভ্রান্তি মাতঃ সংশয় ভঞ্জনী॥
শত্রু সংহারিণী দেবী ত্বংহি মামর বন্দিনী।
প্রসন্ন আস্তিকে ঘোর নাস্তিকাসুর ঘাতিনী॥
জাত্যাভিমান সর্ব্বস্য ভেদ জ্ঞান বিনাশিনী।
নিষ্পাপ সাধকা ধিকঃ পাষণ্ড-চিত্ত-রঞ্জিনী॥
ভাস্কর তারকা ইন্দু সিন্ধু স্থাবর জঙ্গমে।
অসংখ্য জগজ্জীবন রক্ষয়িত্রী প্রসীদমে॥
সর্ব্বত্র ব্যাপিণী মাতঃ সর্ব্বভূতে বিরাজিতে।
জীব মধ্যে স্থিতি কিন্তু স্পর্শভাব বিবর্জ্জিতে॥
সত্য-শান্তি-স্বরূপাত্বং নিত্য-ভাবেন সংস্থিতা।
অনিমা অসীমা রূপা মহাকাশ বিভূষিতা॥
অনল পর্ব্বতারণ্যে পল্লল তটিনী তটে।
শ্বাপদ, উরগ, নক্র ভীষণ শত্রু শঙ্কটে—
রক্ষমে জগতাং মাতা শুভদাত্রী শুভঙ্করী।
বিপন্ন ভীত জীবস্য ত্রাহি মে পরমেশ্বরি॥
দুর্ব্বলস্য বলং দাত্রী মূঢ়ে চৈতন্য দায়িকে।
তব কৃপা বলে মূকে বাক্যং স্ফূরতি অম্বিকে॥
মানব তির্য্যক্ কীট পতঙ্গাদি সরীসৃপা।
আত্মা রূপে অধিষ্ঠাত্রী সর্ব্বজীবে সম কৃপা॥
দুষ্কৃতি দুর্ম্মতি ভগ্ন-হৃদয়ে করুণা প্রদে।

জাগ্রত নিদ্রিত স্বপ্নে বিঘ্নে রক্ষ নিরাপদে॥
জ্ঞান রূপা মহাশক্তি প্রেম-ভক্তি বিদধতে।
স্বর্গীয় ভাস্বর তত্ত্ব দেহি মে শরণাগতে॥
ভীষণ নরক ঘোরং দুস্তর কলুষ ভবে।
অশিবে শুভমাপ্নোতি বিপদে শুভদে শুভে॥
সর্ব্বান্তর্যামিণী মাতঃ বিধ্বংস বিঘ্ন দুর্ম্মতি।
অনাদ্যা অখিল অম্বে দেহি মে শাশ্বতং গতিং॥
নমস্তস্যৈ যোগারাধ্যা যোগী হৃদয় রঞ্জিকে।
নমস্তস্যৈ মহাদেবী মায়াসক্তি বিঘাতিকে॥
নমস্তস্যৈ মহাশক্তি চিণ্ময়ী ভক্ত-বৎসলে।
নমস্তস্যৈ জ্ঞানরূপা ধ্যান যোগেষু মঙ্গলে॥
নমস্তস্যৈ জগন্মাতঃ রক্ষতু পাপ অন্ত্যজে।
নমস্তস্যৈ সত্ত্বরূপে দেহি তত্ত্ব হৃদাম্বুজে॥

এই দিন হইতে কমলাকান্তের পথে পথে করজপা ঘুচিয়া গেল। একমাত্র অদ্বিতীয় ঈশ্বরের উপাসনাই যে পরিত্রাণের উপায়; ইহাই স্থির করিয়া পরিমিত সাকার পূজার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইলেন। তিনি স্বাভাবিক ভাবে যেরূপে ধর্ম্ম পথে অগ্রসর হন, তাঁহার হস্ত লিখিত এক খানি ক্ষুদ্র ডাইরিতে জানিতে পারা গেল। শাস্ত্রানুশীলন ব্যতীত যে, স্বাভাবিক জ্ঞানে সত্যের উজ্জ্বল পথ প্রাপ্ত হওয়া যায়, ইহাঁর জীবনই তাহার একটী দৃষ্টান্ত স্থল, ডাইরিতে গভীর তত্ত্বের প্রশ্নোত্তর ইত্যাদি অনেক কথা আছে। সমস্ত ব্যক্ত করিতে হইলে পুস্তক বিস্তৃত হইয়া পড়ে। তজ্জন্য তিনি যখন যে ভাবে বিশ্বাস, বিবেক, বৈরাগ্য, নির্ভর, প্রেম, ভক্তি, দীনতা এই কয়টী তত্ত্ব ঘটনা সূত্রে পাইয়াছিলেন অবিকল এই খানে ব্যক্ত করা গেল। ইহার ভিতরে অতি রঞ্জিত কোন কথা নাই।

বিশ্বাস—কমলাকান্ত একদিন ধুলিয়ান হইতে সন্ধ্যার প্রাক্কালে

তাঁহার প্রিয় ভ্রাতা শ্রীমন্ত রায় চৌধুরীর বাড়ীতে উপস্থিত হন। বহুবিধ কথা প্রসঙ্গে অনেক রাত্রি হইয়া গেল। বাড়ী যাইবার সময় অত্যন্ত অন্ধকার প্রযুক্ত শ্রীমন্ত রায় চৌধুরী বলিলেন, "একটী লণ্ঠন লইয়া চলিলে কি ভাল হয় না? শুনিতেও পাওয়া যায় বাড়ীতে বড় বড় সাপ যাতায়াত করে; অন্ধকারে এইরূপভাবে যাওয়া কি উচিত হয়?" কমলাকান্ত ইহার উত্তরে বলিলেন, "ভাই! যদি পরমেশ্বর সর্পের দ্বারাই আমাকে গ্রহণ করেন, তবে কি সতর্ক থাকিলেই বাঁচা যায়," এই কথাটী বলিয়া তিনি বাড়ী আসিলেন। সেদিন কোনই বিঘ্ন ঘটিল না। মানব-চিত্ত সততই চঞ্চল—কমলাকান্ত চঞ্চলতার আঘাতে অবিশ্বাসী হইয়া পরদিন লণ্ঠনটী পরিষ্কার করিলেন এবং তাহাতে বাতি প্রভৃতি সজ্জিত করিলেন।

একদা বাসগৃহের বারান্দায় বসিয়া একটী প্রবন্ধ লিখিতেছিলেন। তাঁহার দক্ষিণ পাখানি ঘরে উঠিবার ধাপের ৪।৫ অঙ্গুলী উর্দ্ধে রহিয়াছে। কখন যে বিস্তৃত ফণা বিশিষ্ট গোক্ষুর সর্পটী আসিয়াছিল তিনি তাহা জানিতে পারেন নাই। সর্পটী ফণাবনত শরীর কুণ্ডয়ন করিয়া তাঁহার দক্ষিণ চরণ তলে অবস্থিতি করিতেছিল। প্রবন্ধ শেষ হইলে দেখিলেন যে প্রকাণ্ড সর্প তাঁহার পদতলে! তিনি ব্যস্ত সমস্ত ভাবে পা খানি উঠাইয়া লইলে সর্পটী অতি ধীরভাবে চলিয়া গেল। কমলাকান্ত প্রথমে ভয় পাইয়াছিলেন কিন্তু পরক্ষণেই ভক্তি সহকারে সর্পটীকে প্রণাম করিয়া ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়া আনন্দচিত্তে বলিয়াছিলেন, "প্রভো! তুমি প্রত্যক্ষ, এ বিষয় কিছুই সন্দেহ নাই। অবিশ্বাসী হইলেও বিশ্বাসের পথ দেখাইয়া দাও। বিশ্বাস করিলে ভুজঙ্গও পদানত হয়।" তখন হইতে কমলাকান্তের হৃদয়ে ঈশ্বরের প্রতি অনুরাগ বিশ্বাস দৃঢ়রূপে অঙ্কিত হইল, আর অবিশ্বাসী হইতে পারিলেন না।

বিবেক—কমলাকান্ত একদিন মধ্যাহ্ন সময় রান্না করিতেছিলেন।

তাঁহার বাড়ীতেই কূপ ছিল। জল তুলিবার জন্য একগাছি দড়িতে একটী ঘটী সংলগ্ন করিয়া ঐ কূপ গর্ভে নামাইলেন। কূপের অর্দ্ধ পরিমাণ স্থানে ঘটিটী গিয়াছে এমন সময়ে কমলাকান্তের হৃদয়ে একটী কথা আসিল, 'সাঁপ আস্‌ছে!' কমলাকান্ত ওটা কিছুই নয় বলিয়া একেবারে উপেক্ষা করিলেন। ঘটিটী আরও কিছু দূরে গিয়াছে, পুনর্ব্বার শুনিলেন, 'সাপ যে এলো!' আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, পাত্র-বদ্ধ রজ্জু সবেগে আকর্ষণ করিতে যেন আর সময় পান না। যাই ঘটিটী হস্তগত হইল, অমনি দূরে দাঁড়াইলেন, তিনি যে স্থানে দাঁড়াইয়া জল উঠাইতে ছিলেন, ঐ স্থানেই একটী বিস্তৃত-ফণা সর্প আসিয়া উপস্থিত হইল। কিছুকাল পরে কোথায় চলিয়া গেল। কমলাকান্ত এই ব্যাপারে বুঝিলেন, হৃদয়ের মধ্যে অনাহুত শব্দে ঈশ্বর কথা কহেন, ইহাই বিবেক নামে অভিহিত, সেই অবধি তিনি বিবেকের দ্বারা পরিচালিত হইবার জন্য সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকিতেন। ইহাতে তাঁহার বিবেকের প্রতি অবিচলিত শ্রদ্ধা জন্মে।

বৈরাগ্য—কোন সময়ে কমলাকান্ত আপনার আশ্রম ঘরের বারান্দায় বসিয়া আছেন। এমন সময় ঐ বারান্দার সম্মুখে একটী ক্ষুদ্রজাতীয় মাকড়সা আসিয়া জাল প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিল। মাকড়সাটী বহু কষ্টে একবার নিম্নে একবার ঊর্দ্ধে এইরূপ বহুবার যাতায়াত করিয়া মুখ হইতে লালা দ্বারা জালের গঠন-সূত্র স্থাপন করিল। পরে চক্রবৎ ভ্রমণ করতঃ পরিশ্রম-প্রযত্নে জাল নির্ম্মাণ করিতে লাগিল। উহাতে উহার প্রাণের আশা এই যে, মাছি, মশা বা কোনপ্রকার কীট তাহাতে পড়িয়া বদ্ধ হইলে পরিশেষে ভক্ষণ করিবে—কিন্তু সে আশা ক্ষণকাল মধ্যেই নিষ্ফল হইল; যাই কার্য্য সমাধা করিয়া স্বরচিত জালের কেন্দ্রস্থানে বসিল, অমনি কোথা হইতে একটী কুম্‌রে পোকা আসিয়া তাহাকে ধরিল এবং কোথায় লইয়া গেল, আর দেখা গেল না।

কমলাকান্ত এই ঘটনাটী দেখিয়া ভাবিয়াছিলেন, ( মাকড়সাটী বিপুল আসক্তির বশবর্ত্তী হইয়া জাল প্রস্তুত করিল, উহার কার্য্যও সম্পূর্ণ হইয়া গেল, শেষে উহাকে প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে হইল ! ) আমিও ত সংসার জালে বদ্ধ রহিয়াছি ! ঐরূপ মাকড়সার মত আমাকেও ত কালের মুখে যাইতে হইবে। হায় ! তবে কোথায় যাই—ছাই মাখিয়া কি বনেই যাই ? মন যে তা চায় না। সেখানেও যে কন্দমূল-ফলাসক্তি ! বিরক্ত বৈরাগ্য ত কিছুই নহে ! হঠাৎ হৃদয়ের ভিতরে শুনিতে পাইলেন, "অসার আসক্তি সংগ্রামে জয়ী হইতে পারিলে প্রকৃত বৈরাগ্যের আশ্রয় পাওয়া যায়। আশ্রম অনাসক্ত বৈরাগ্য সাধন করিলে সংসার বিষের নিকেতন না হইয়া অমৃতের আলয় হয়।" এই কথাটী বুঝিতে পারিয়া আশ্রম অনাসক্ত বৈরাগ্য সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। কোন প্রকার প্রিয় বস্তু নষ্ট হইয়া গেলেও তজ্জন্য দুঃখিত না হইয়া বরং অনাসক্তি প্রদর্শন দ্বারা আনন্দ সম্ভোগ করিতেন। সংসারের নানাবিধ কার্য্যের প্রতি কর্ত্তব্য পালন করা একান্ত প্রয়োজন বুঝিয়াও কোন প্রকার বস্তু বা কার্য্যের অভাব নিবন্ধন যাহাতে আসক্তি না জন্মে ইহারই প্রতি সম্পূর্ণ সচেষ্ট থাকিতেন। এইভাবে বিবিধ বিষয়ের মধ্যে বৈরাগ্য সাধন করা স্থির করিয়াছিলেন। যখনই কোন প্রকার আসক্তি জনিত কষ্ট অনুভব হইত, তখনই অত্যন্ত অনুতপ্ত হইতেন। সকল প্রকার বৈরাগ্যের মধ্যে তিনি আশ্রম অনাসক্ত বৈরাগ্যকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করিতেন।

নির্ভর—কমলাকান্তের বিদ্যা, বুদ্ধি, মেধা বল কমই ছিল। ভগবৎ কৃপায় স্বাভাবিক ভাবের ভিতর দিয়া তিনি গভীর তত্ত্ব সকল বুঝিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। পৌষ কি মাঘ মাসে অর্থাৎ শীতকালে নিজ বাড়ীর উঠানে বসিয়া উপাসনা করিতেছিলেন। আরাধনার পর একটু ধ্যান করা নিয়ম ছিল, ধ্যানস্থ হইলে অব্যক্ত আলোকে

তাঁহার হৃদয়, মন, প্রাণকে আকুল করিয়া তুলিল। সেদিন মাতৃভাবে উপাসনা হয়, মাঝে মাঝে মায়ে-ছায়ে প্রশ্নোত্তর চলিল, এমন আনন্দময় গভীর ধ্যানকালে হঠাৎ উদরের চিন্তা আসিয়া তাঁহার চিত্তকে অন্ধকারে আচ্ছন্ন করিল। আর ঐ ভাবটী থাকিল না, দুঃখে একান্ত অধীর হইয়া এই কথাটী বলিয়াছিলেন, "হায়! উদরটা কি ভয়ানক শত্রু! রান্নার দায় কি ঘুচিবে না!" পুনর্ব্বার ধ্যানে প্রবৃত্ত হইলেন, পূর্ব্ববৎ মায়ে-ছায়ে কথাবার্ত্তা আরম্ভ হইল। ধ্যান-তৃপ্তির অবসানে চক্ষু খুলিয়া দেখিলেন, শ্রীনাথ রায় চৌধুরীর মাতাঠাকুরাণী কখন যে চাকরের হস্তে উত্তম চিড়া, ঘন দুগ্ধ, সন্দেশ ইত্যাদি খাদ্য দ্রব্য পাঠাইয়া দিয়াছেন তাহা তিনি কিরূপে জানিবেন? জিজ্ঞাসা করিলেন, এখানে কেন? চাকরটী বলিল, কর্ত্রী মা আপনার খাবার পাঠাইয়া দিয়াছেন। কমলাকান্ত ঐ সমস্ত খাদ্য দ্রব্য লইয়া আহার করিবেন কি অশ্রু পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়া, আপনাকে কৃতার্থ বোধ করিলেন। নির্ভর করিতে পারিলে যে কিছুরই অভাব থাকে না, ইহা প্রত্যক্ষ জানিয়া সেই অবধি নির্ভর সাধনে অনুরক্ত হইলেন।

প্রেম—ভালবাসিলেই ভালবাসে এ কথা অতি সত্য। কমলাকান্ত যাহা রন্ধন করিতেন পশু পক্ষী প্রভৃতিকে কিছু দিয়া পরে ভোজন করিতেন। একদা গ্রীষ্মকালে অত্যন্ত উত্তাপের সময় একটী ফিঙ্গা পাখী তৃষ্ণাতুর হইয়া কমলাকান্তের বাসগৃহের ভিতরে প্রবেশ করিল। ঐ ঘরের একদিকে একখানি খাটের সম্মুখে একটী মাটির কলস ছিল, তাহারই উপর পাখীটী বসিল, কিন্তু জল কিছুদূর ব্যবধানে থাকাতে তাহার জল পান করিতে বিঘ্ন হইল। পাখীটী নিরাশ হইয়া অত্যন্ত কাতরভাবে শেষে ঐ খাটের পশ্চিম শিয়ানায় বসিল এবং সতৃষ্ণ নয়নে চাহিয়া রহিল। ঐ ফিঙ্গা পাখীটীর ঈদৃশ কাতর অবস্থায় কমলাকান্ত

অতি নিঃশব্দে একটী মাটির কটরায় জল ঢালিয়া কিছুদূরে রাখিলেন। পাখীটী আবার উড়িয়া পূর্ব্ব শিরাঁনায় একটু অন্ধকারে বসিল। কমলাকান্ত দক্ষিণ হস্তে ঐ জলপূর্ণ কটরাটী তাহার সম্মুখে ধরিলেন। ফিঙ্গা আনন্দে চঞ্চু ডুবাইয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত স্থিরভাবে জলপান করিল। জলপান শেষ হইলে ঐস্থানেই বিশ্রাম করিতে লাগিল। ঐ সময় কমলাকান্ত বিশেষ কোন কার্য্য বশতঃ ধুলিয়ান যাইবেন, কিন্তু ঐ ঘরে বহুদিন হইতে একটী পেচক বাস করে, ভাবিলেন ঘর বন্ধ করিয়া গেলেই পেচকটী নিশ্চয়ই পাখীটিকে বধ করিবে, অতএব উহাকে উড়াইয়া দেওয়া যাক্। যেমন বাম হস্তখানি তাহার নিকট লইলেন, অমনি ফিঙ্গা তাঁহার ঐ ভুজ ভুজঙ্গ বোধ করিয়াই কি উড়িয়া গেল? উঠানের মাঝখানে একটী বৃহৎ আম্র বৃক্ষ ছিল, তাহারই ঘন পল্লবাবৃত নিরাপদ শাখায় বসিয়া রহিল। কমলাকান্ত প্রেমের অসদ্ব্যবহারজনিত অনুতাপে অধীর হইয়া পাখীটাকে যে কত আহ্বান করিলেন, কিন্তু সে আর কিছুতেই আসিল না। দক্ষিণ হস্তে জল খাইল, বাম হস্ত দেখিয়া উড়িয়া গেল, এই বিষম অনুতাপে কমলাকান্তের অশ্রুধারা কিছুতেই থামিল না। তিনি এইরূপ আশ্চর্য্য ঘটনার মূলে প্রেমের সদাচার ও অসদাচার বুঝিতে পারিয়া অবাক্ হইলেন, তখন হইতে প্রেমের প্রতি তাঁহার অকৃত্রিম অনুরাগ জন্মিল।

ভক্তি—এটীও 'ডায়েরী' হইতে উদ্ধৃত। কমলাকান্ত নির্জ্জনে কোন গভীর বিষয়ের চিন্তা করিতেছিলেন। হঠাৎ তাঁহার হৃদয় মধ্যে একটী কথা আসিল, "চণ্ডালের পদধূলি মাথায় দাও।" কথাটী বুঝিতে পারিয়া তাঁহার প্রাণ চণ্ডালের পদধূলি লইবার জন্য অত্যন্ত আকুল হইল। ভাবিলেন, চণ্ডাল কে? পরিশেষে স্থির করিলেন, ডোমেরাই ত (কুকুরাদি বধ) নৃশংসের কার্য্য করে, তাহাদেরই পদধূলি লওয়া উচিত, কিন্তু তাহারা ঐ কার্য্যে সম্মত হইবে কেন? আবার ভাবিলেন

ডোমের পদাঙ্ক ধূলি মস্তকে লইলেও ত হয়! কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। নানাকার্য্যের উদ্যমে ঐ কথাটী ভুলিয়া গেলেন।

কমলাকান্ত কোন সময় শ্রদ্ধেয় বনমালী বাবুকে সঙ্গে লইয়া ধুলিয়ান যাইতেছিলেন, পথিমধ্যে সহসা ঐ কথাটী স্মরণ হইল। তখন অত্যন্ত ব্যাকুল প্রাণে চিন্তা করিতে লাগিলেন, হায়! কোথায় চণ্ডালের পদধূলি মিলিবে, এইরূপ ভাবিতেছেন, ইতিমধ্যে হৃদয়ের নিভৃত স্থানে একটী কথা শুনিতে পাইলেন, "কাছেই পাবে ভাব্‌ছ কেন, তুমি কি?" কমলাকান্ত যারপরনাই আনন্দভরে নিজের পদধূলি নিজের মস্তকে বারংবার দিতে লাগিলেন। শ্রদ্ধেয় বনমালী বাবু আদ্যোপান্ত কথাগুলি শুনিয়া অবাক্ হইলেন। কমলাকান্ত এইকথাটী বলিয়াছিলেন, মানুষ আপনাকে পাপী মনে না জানিলে পাপ পরিত্যাগ করিতে পারে না। অন্যের চরিত্র অন্বেষণ করিতে গিয়া নিজে যে গভীর নরকের ভিতরে প্রবেশ করে তাহা বুঝে না। হৃদয় স্ফীত করিয়া যে আপনাকে সাধু মনে করে, সেই ব্যক্তিই অসাধু, জগতের এমন কি ক্ষুদ্র কীটও তাহা হইতে শ্রেষ্ঠ। পৃথিবী যাহাকে নীচ ভাবিয়া থাকে, তাহাকেই মস্তক অবনত করিতে হয়। পঙ্গু, অন্ধ, কুষ্ঠরোগগ্রস্ত সকলকেই বুকে ধরা ও সকলেরই পদধূলি গ্রহণ করা ইহাই ত অপ্রভেদ ভক্তি। ধনী, দরিদ্র, রাজা, প্রজা, পশু পক্ষ্যাদি পর্য্যন্ত যিনি প্রেমের চক্ষে দেখিতে পারেন, তিনিই ধন্য। উচ্চ, নীচ, সাধু, অসাধু, সম্মান, অপমান সমান না হইলে ভক্তি স্থায়ী থাকে না। ভক্তি গুরু লঘু এক করিয়া দেয়। ভক্তির ভেদত্বই পাপের মূল। পিতা-মাতা, মেথর চণ্ডাল, সমভক্তির আধার। পৃথিবী বিরক্ত হয় হউক, তজ্জন্য ভাবনা কি? কমলাকান্ত এইরূপ অপ্রভেদ ভক্তির শিক্ষা পাইয়া সেই সময় হইতে ভক্তির সাধনে প্রাণ উৎসর্গ করিলেন।

**দীনতা**—ব্রহ্মজ্ঞানে জাতি ও প্রাণীভেদ নিতান্ত বিরুদ্ধ। কমলা-

ক্রান্ত একদিন ভ্রমবশতঃ কুকুরকে উচ্ছিষ্ট খাদ্য দিয়া আবার ভাবিতে লাগিলেন, মানুষকেই যে একভাবে দেখিতে হইবে, অন্যান্য প্রাণীকে তদ্রূপ বুঝিতে হইবে না, এটী ত ব্রহ্মজ্ঞানের কথা নহে। কুকুরকে উচ্ছিষ্ট দেওয়া সঙ্গত হইল কি? ইহাতে কি ভেদ-ভাব দ্বারা আপনাকে উচ্চ জাতির মধ্যে গ্রহণ করা হইতেছে না? কিছুকাল এই ভাবে চিন্তা করিতেছেন, হঠাৎ হৃদয়ে বুঝিলেন, "উচ্ছিষ্ট খাওয়ালে পেতে হয়।" তখন তাঁহার প্রাণ প্রেমে অধীর হইয়া উঠিল, আর বিলম্ব করিতে পারিলেন না। তখন হইতে পশু পক্ষী কীটাদি প্রাণিগণকে অগ্রে খাদ্য দিয়া পরে ভোজন করিতেন এবং সকল প্রাণীর নিকট নীচ বা ক্ষুদ্র হইবার জন্য ব্যাকুল হইলেন।

দেখিতে দেখিতে সাম্বৎসরিক উৎসব দিন সমীপবর্ত্তী হইল। সুখময় হালদার মহাশয়ের বাসায় উৎসবের কার্য্য সঙ্কুলন অসম্ভব বুঝিয়া নন্দবাবুর বাড়ীর নিকট তাঁহারই আম্র বাগানে একখানি ক্ষুদ্র ঘরে সকল আয়োজন হইতে লাগিল। কাত্তিক মাসের ১৪ই তারিখ হইতে তিন দিবস উৎসব—শেষ দিন, কীর্ত্তন হইয়া শেষ হইবে। কিন্তু সকলেই পরমেশ্বর মল্লিক মহাশয়ের জন্য বড় অভাব বোধ করিতে লাগিলেন। ঈশ্বরের কি অপার করুণা! সেই সময় মল্লিক মহাশয় ধুলিয়ানে উপস্থিত। তাঁহার আগমনে উৎসবের আয়োজন কিছু বেশী রকমেই আরম্ভ হইল। এখানে বসুজা (মল্লিক) মহাশয়ের জীবনে ভগবানের লীলার ভাব একটুকু পাঠককে না জানাইয়া থাকিতে পারা গেল না। মল্লিক মহাশয় যখন এখান হইতে স্বকৃত পাপ দংশনে অধীর হইয়া কলিকাতায় যান, তখন আভ্যন্তরিক যাতনার মূল কারণ কিছুই জানিতে পারা যায় নাই। একটুকু আভাস মাত্র জানা যায় যে তিনি শালিখায় কোন আফিসে কার্য্য করিতেন, সরকারী তহবিল তছরুপাত করা অপরাধে ফেরারী হন। ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রবল উত্তেজনায়

নিজে অপরাধ স্বীকার করিয়া হাওড়ার বিচারপতি বঙ্কিম বাবুর সমক্ষে "আমি এই অপরাধে অপরাধী, আপনি দণ্ড বিধান করুন।" এই বলিয়া বারংবার কাতর প্রার্থনা করেন। বিচার বিবরণ, "পাপীর জীবনে ভগবানের লীলা" গ্রন্থে বিবৃত আছে। মূল কথা তিনি ঈশ্বর বিশ্বাসী একজন আদর্শ পুরুষ। প্রভুর কৃপাতে ভীষণ পরীক্ষা হইতে মুক্তিলাভ করিয়া ধুলিয়ান ব্রাহ্মসমাজের উৎসবে যোগ দিবার জন্য অত্যন্ত আগ্রহাতিসহকারে উপস্থিত হন। তাঁহার আগমনে সকলেই আহ্লাদিত হইয়াছিলেন। অতি অল্পসংখ্যক লোকের দ্বারা আশাতিরিক্ত জমাটভাবে তিনদিন উৎসব হওয়া উৎসবেশ্বরের কৃপা ব্যতীত আর কি বলা যাইতে পারে। ১২৯১ সালে অমৃতলাল সাহা ও মাণিক চন্দ্র কর্ম্মকার মঙ্গলময় বিধাতার আকর্ষণে রীতিমত উৎসবে যোগ দেন এবং পরিশ্রমের সহিত কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পন্ন করিতে ক্রটী করেন নাই। সকলেই ব্রহ্মানন্দ ভোগ করিয়া আপনাকে কৃতার্থ বোধ করেন।

---

## ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

এইভাবে প্রচার ও সমিতির কার্য্য সুন্দর চলিতে লাগিল। এই বৎসর কমলাকান্তের জীবনে একটী পরীক্ষা উপস্থিত হয়। এ প্রদেশে অনাবৃষ্টি জনিত আশু ধান্য আদৌ যথাসময়ে রোপিত হইতে পারে নাই। তদনন্তর বন্যা দ্বারা অল্প বর্দ্ধিত ধান্য নিমজ্জিত হইয়া যায়। ইহাতে কৃষিজীবি মধ্যে সম্পূর্ণরূপেই অন্নকষ্ট হয়। প্লাবন জন্য, এমন কি, শ্রমজীবি ও দরিদ্র নিরাশ্রয় ব্যক্তির কোনই উপায় ছিল না। এই সময়ে কমলাকান্ত ভিক্ষা-সম্বল অন্ধ, খঞ্জ রোগাক্রান্ত ব্যক্তিদিগের আর্ত্তনাদ শুনিতে পাইয়া কি করিবেন, নিজের অবস্থা অতি শোচনীয় কাজেই ভিক্ষার ঝুলি স্কন্ধে গ্রহণ করিলেন। একটী পয়সা ও একমুষ্টি

চাউল, যিনি যাহাই দেন, সাদরে গ্রহণ পূর্ব্বক ঝুলি পূর্ণ করেন। আবার নিজেই স্কন্ধে বহিয়া ঐ সকল বুভুক্ষিত দুঃখী ব্যক্তিগণকে যাহার যত প্রয়োজন দিতেন। একদিন শুনিলেন একটী নিঃসহায় অতি দুঃখী বৃদ্ধা, তিন দিন অনশনের পর জঠরানলের অসহ্য যাতনায় নিকটস্থ একটী ক্ষুদ্র নদীতে ডুবিতে যায়। কোন দয়ার্দ্র ব্যক্তি তাহাকে রক্ষা করেন, কমলাকান্ত এই কথা শুনিবামাত্র অত্যন্ত ব্যাকুল হইলেন এবং নিকটে গিয়া বলিলেন, "মা! তোমাকে আর নদীতে ডুবিতে হইবে না, আমি প্রতিদিন ঈশ্বরেচ্ছায় তোমায় উপযুক্ত খাবার দিব।" বৃদ্ধা "বেঁচে থাক বাবা!" বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিল। কমলাকান্ত পূর্ব্ব দিন ভিক্ষা দ্বারা সংগ্রহ করেন, পরদিন সমুদায় বিতরণ করিয়া আসেন। বন্যার জল কোন স্থানে একহাঁটু, কোন স্থানে এক বুক ভাঙ্গিয়া বাড়ী হইতে যাইতে হয়, তাহার উপর সন্ধ্যার সময় নিজে রান্না করেন। একদিন আলু কি বড়ী এমন কি, লবণ পর্য্যন্তও ছিল না; কেবল চাউল ছিল। সুতরাং শুধু অন্নই ভোজন করিতে হইয়াছিল। বন্যা কমিতে আরম্ভ হইল, এদিকে কমলাকান্ত অনিয়ম ও অত্যধিক পরিশ্রমে পীড়িত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার শুশ্রূষা করিবার জন্য একটীও লোক ছিল না; সুতরাং প্রিয় ভ্রাতা শ্রীমন্ত রায় চৌধুরীর বাড়ীতে অবস্থিতি করিলেন। কমলাকান্ত আশ্বিন মাসের শেষ হইতে কার্ত্তিক মাস পর্য্যন্ত রোগ শয্যায় থাকেন। তখন এ প্রদেশে প্লাবন কষ্ট আর ছিল না, কিন্তু অন্নকষ্ট ছিল। ঐ সময় ধুলিয়ানের দ্বিতীয় সাম্বৎসরিক উৎসব আরম্ভ হইল। এজন্য গঙ্গাচরণ ঘোষ, নন্দলাল পাল, সুখময় হালদার, ইহাঁরা কমলাকান্তের তত্ত্বাবধান করিতে রীতিমত পারেন না, তথাপি একটুকু সময় পাইলেই আসিতেন। এই বৎসর নব-বিধান সমাজ হইতে শ্রদ্ধেয় নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রচারক মহাশয় আইসেন। তিনি উৎসবের পূর্ব্বে এক দিবস রোগ-শয্যা শায়িত কমলাকান্তকে দেখিতে

আসিয়াছিলেন। কমলাকান্ত ভয়ানক শ্লৈষ্মিক পীড়ায় আক্রান্ত হইয়াও তাঁহার সহিত ধর্ম্মালোচনা করেন। শ্রীমন্ত রায় চৌধুরী কমলাকান্তের সহোদর ভ্রাতার ন্যায় আজ্ঞাবহ হইয়া শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। ধুলিয়ানের উৎসব শেষ হইয়া গেল, কমলাকান্তও ভীষণ ব্যাধি হইতে কতকটা আরোগ্যলাভ করিলেন।

শ্রীমন্ত রায় চৌধুরীর প্রাণপণ সেবা শুশ্রূষায় কমলাকান্ত তাঁহার নিকট ঋণী। একদিন তিনি বলিলেন, "শ্রীমন্ত! আমি এখন বেশ আরোগ্য হইয়াছি, আশ্রমে গেলে এই সময় কতকটা কার্য্য হয়, তুমি কি বল?" শ্রীমন্ত বাবু বলিলেন, "আপনার ইচ্ছার প্রতি কোন কথা চলে না, কোন কষ্ট ত হবে না?"

কমলাকান্ত নিজ বাড়ীতে আসিলেন। তাঁহার বাড়ী আসার সংবাদ পাইয়া প্লাবন জনিত দুর্ভিক্ষ ক্লিষ্ট দুঃখী নর-নারী সকলেই দেখা করিবার জন্য আসিতে লাগিল। কমলাকান্তের আরোগ্য শরীর দেখিয়া তাহারা আহ্লাদিত হইল। মাঝে মাঝে অন্নকষ্টে একান্ত কাতর হইলে পূর্ব্বোক্ত বৃদ্ধা প্রভৃতি কয়েকটী অনাথা আসিত, কমলা-কান্ত কিছু কিছু দিতেন।

কমলাকান্ত তখন হইতে সাপ্তাহিক সমিতিতে যোগ দিতে লাগিলেন। কিছুদিন পরে একটী বিষাদ ভাবের কার্য্য উপস্থিত হইল। স্থানীয় ভদ্রমণ্ডলীর মধ্যে কতকগুলি লোক একটী সামান্য কারণ ধরিয়া সুখময় বাবুকে স্কুলের কার্য্য হইতে অবসর করাইলেন। কিছুদিন পরে গঙ্গাচরণ বাবুও বিষয় প্রলোভনে পড়িয়া ব্রাহ্মসমাজ ছাড়িলেন। একে একে অনেকেই সরিয়া পড়িলেন, সুখময় বাবু ও গঙ্গাচরণ বাবু প্রভৃতি চলিয়া যাওয়াতে সমিতির বড় বিঘ্ন সংঘটিত হইল বলিতে কি, সমিতিটী স্থায়ী হইল না।

কমলাকান্ত ও নন্দবাবু একেশ্বরবাদ ধর্ম্মের জ্বলন্ত বিশ্বাস ছাড়িলেন

না, কিন্তু পরস্পর ব্যবধানে থাকাতে এবং ধর্ম্মবন্ধুগণের বিচ্ছেদ নিমিত্ত সমিতি যোগটী একবারে ভাঙ্গিয়া গেল, বস্তুতঃ ধর্ম্ম পিপাসায় কোন ব্যতিক্রম হইল না। তাঁহাদের নিজ নিজ বাড়ীতে রীতিমত উপাসনার কার্য্য অনুরাগের সহিত চলিতে লাগিল। এই সময় বহু পরিশ্রম সহকারে কমলাকান্ত ধুলিয়ান বন্দরের স্থানে স্থানে বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন, ঐ সমস্ত বিষয় নিজেই লিপিবদ্ধ করিয়া বিতরণও করেন, এতদ্ভিন্ন অনেক প্রবন্ধ লিখিতে প্রবৃত্ত হন। ইহাতে কমলাকান্তের ধর্ম্মবলের কোন ব্যতিক্রম ঘটিল না, কেবল ধর্ম্মবন্ধুর সহিত মিলিত হইয়া সমিতি আলোচনায় বঞ্চিত থাকায় বড় অভাব বোধ করিতেন। নন্দবাবুও চিকিৎসা উপলক্ষে যেখানে যান, তথায় ধর্ম্ম প্রচার করিতে উদাসীন নহেন। বাস্তবিকই সকল অবস্থার মূলে ঈশ্বরের মঙ্গল বিধান নিহিত আছে। এইরূপে প্রচার করাতে প্রদেশবাসী অনেকের প্রাণে অন্ধ-বিশ্বাস কতকটা কমিয়া গেল। সাকার পূজার প্রতি কিছু কিছু বীতশ্রদ্ধাও জন্মিতে লাগিল; প্রথমাবস্থায় যেমন অগ্নি কল্প তীক্ষ্ণদৃষ্টি ছিল, সেরূপ তীব্র দৃষ্টিটা যেন অধিকাংশ ব্যক্তিরই প্রায় দেখা যায় না। সকলে একেশ্বরবাদ মহাধর্ম্মের কথা আগ্রহের সহিত শুনিতে লাগিলেন। কিন্তু ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, কায়স্থ প্রভৃতি উচ্চজাতির মধ্যে অনেকেরই তীব্র তাড়নাটী ঘুচিল না। সমিতি ভাঙ্গিয়া গেল বলিয়া তাঁহাদের মনে কোন কষ্ট হয় নাই। ঐ মহাধর্ম্মের মহত্তত্ব সম্বন্ধীয় আলোচনা উপস্থিত হইলে জৃম্ভিকা পরিত্যাগ করতঃ "ওটা কিছুই নয় ব্রহ্মজ্ঞানী হওয়া বড় শক্ত কথা!" এই বাঁধি বোলটী বলিতে তাঁহারা ক্রটী করেন না।

কমলাকান্তের অনেক দিন হইতে ঢাকা পরিদর্শনের বড় ইচ্ছা ছিল। ১২৯৩ সালের ভাদ্র মাসের শেষে একটী সুযোগ সংঘটিত হইল। ময়মনসিংহের অন্তর্গত কোন স্থানে একখানি নৌকা যাইতেছে, ঐ নৌকায় তিনি বিনা ব্যয়ে চলিয়া গেলেন।

কমলাকান্ত ঢাকা সহরে একটী ছাত্র-নিবাসে আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন; রবিবার সান্ধ্য সময়ে নব-বিধান সমাজ-মন্দিরে উপস্থিত হইলেন। উপাসনা শেষ হইলে কমলাকান্ত এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখানে শশিবাবু আছেন কি?" তিনি অঙ্গুলি সঙ্কেতে দেখাইলেন, "ঐ যে শশিবাবু।" শশিবাবু নিকটে আসিয়া বলিলেন, "আপনার নিবাস কোথায়!" কমলাকান্ত উত্তর দিলেন "ধুলিয়ান।" তাঁহার গৈরিক বস্ত্র পরিধান দেখিয়া বলিলেন, "আপনি কি কমলাকান্ত বাবু?" "হাঁ আর বাবু উপাধি দিয়া কাবু করিবেন না" শুনিয়া সকলে হাসিতে লাগিলেন। শশিবাবু শ্রদ্ধার সহিত তাঁহাকে আফিস গৃহে লইয়া গেলেন। অনেক কথাবার্ত্তার পর কমলাকান্ত ছাত্রদিগের বাসাতে সে রাত্রেও বাস করিলেন। পরদিন প্রাতঃকালে শশিবাবু কমলাকান্তের ঝুলিটী নিজেই লইয়া তাঁহাকে ইষ্ট প্রেসের দ্বিতল আফিসের একটী কুঠরীতে থাকিবার স্থান দিলেন। সকলের সহিত ক্রমে ক্রমে আত্মীয়তা জন্মিল; সাধু সম্মিলনে বড়ই প্রীতি লাভ করিলেন।

কমলাকান্তের দোষই বলুন আর গুণই বলুন, তিনি যে বিষয়টী বিশ্বাস করিতেন, তাহা কিছুতেই ভুলিতেন না। নব-বিধান সমাজে গিয়া নব-বিধানেরই সন্দেহ ভাবের আলোচনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু সুখের বিষয় এই যে তাঁহার অকৃত্রিম ও অপ্রভেদ ভালবাসায় কেহ বিরক্ত হইলেন না। এইভাবে কিছুদিন চলিয়া যায়। একদিন শশিবাবু পিতৃ-বন্ধু কমলাকান্তকে কোন একটী বাগানে লইয়া গেলেন। সেখানে তাঁহাদের ধর্ম্মালোচনা যেরূপ হয়, তাহা সঙ্ক্ষেপে কিছু ব্যক্ত করা গেল।

শশিবাবু। আপনি আমার পিতৃ-বন্ধু, সন্দেহ ভঞ্জনের জন্য কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি?

কমলাকান্ত। কেন পারিবেন না? আপনি ত আমার হৃদয়ের নিভৃত কক্ষের রক্ষিত বস্তু।

শশিবাবু। বিধান-প্রবর্ত্তক আচার্য্য মহাশয় "নব-বিধান" সম্বন্ধে যে সকল গূঢ় তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছেন, বোধ হয় তাহার মর্ম্ম আপনি বিজ্ঞাত হইতে পারেন নাই; বুঝিলে, কখনই বিধানবাদে প্রতিবাদ করিতেন না। যাঁহার বক্তৃতার ওজস্বিনী প্রতাপে ইয়ুরোপ পর্য্যন্ত কম্পিত, তাঁহারই বিধানে সন্দেহের কথা! এটী কি আপনার মত ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব হয়?

কমলাকান্ত। সেকি! আমি হৃদয়-গ্রন্থে যে সকল তত্ত্ব-কথা অবগত আছি। মানুষ আসক্তি, ভ্রান্তির অতীত হইতে পারে না, কেননা, মানবের ক্ষুদ্রাধারে সম্যক সত্য বিকাশ হওয়া অসম্ভব। বুদ্ধ, নানক, চৈতন্য প্রভৃতি ধর্ম্মপ্রচারক সকলেই প্রকৃত সত্যের লালসায় জীবন সঙ্কল্প করেন। পরিশেষে এক একটী সম্প্রদায় হইয়া নানাধর্ম্মে বিভক্ত হইয়াছে। ঐ দেখুন, প্রথমে আদি ব্রাহ্মসমাজ, মধ্যে ভারত ব্রাহ্মসমাজ, পরে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ দেখিতে দেখিতে তিনটী সমাজে তিনটী মত প্রচার হইয়া গেল। আর যে কত হইবে তাহা কে বলিতে পারে? জলৌকা যেমন একটী তৃণকে অবলম্বন করিয়া অপরটীকে আশ্রয় করে, ধর্ম্মের মতও ঠিক তেমনি।

শশিবাবু। ঐ যে সম্মুখস্থিত বৃক্ষটী নূতন ও পুরাতন পত্রে সজ্জিত রহিয়াছে, ইহাতে কি ঈশ্বরের বিচিত্রভাব প্রত্যক্ষ নহে? বিধানতত্ত্বও সময়োচিত বিভূ কর্ত্তৃক পরিবর্ত্তন সূত্রে প্রকাশিত হইতেছে, এ কথার কোনই সংশয় নাই। তবে কেন যে আপনি নূতন বিধান মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে চান না, এ বড় দুঃখের কথা। আপনি নূতন বিধান পন্থারই একজন পথিক হইয়া বন্ধুর পথ অনুসরণ করিতেছেন কেন?

কমলাকান্ত। হাঁ। তাহাই বটে! আমি ত পূর্ব্বেই বলিয়াছি,

ধর্ম্মের গতি জলৌকাবৎ। যেটা সত্য, তাহাই প্রাণের প্রিয় বস্তু বলিয়া ধরিতে হয়। আপনি একবার ঐ বৃক্ষটীর মূলদেশ দেখুন ত—মূল দৃষ্টিতে নূতন পুরাতনের কোন চিহ্ন পাইতেছেন কি? কখনই না। আবার যদি উহার বীজটী কখনও দেখিতেন, তবে আর ঐ বীজ ব্যতীত কিছুই দেখিতেন না। অথচ উহার ভিতরে শাখা প্রশাখা, কাণ্ডাদি-বৃক্ষের সমুদায় অবয়ব নিহিত থাকে। এই যে বিচিত্রতা, ইহাও বিভুর সঙ্গে অনন্তকাল স্থিতি করিতেছে, কিন্তু উহাও সাধকের পরীক্ষার বাহ্যিক প্রলোভন। নিত্য নিরাকার অখণ্ড চিন্ময় ব্রহ্ম বিধানে কি নূতনত্ব কিছু সম্ভব হইতে পারে? আরও বুঝুন, দুইটী নূতন পুরাতন চক্রের ছিদ্র-দ্বারে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে একমাত্র আকাশই দেখা যায়, তখন ঐ চক্রের নূতন পুরাতন কোথায়? বস্তুতঃই প্রজ্ঞা-চক্ষুর দৃষ্টিতে বাহ্যিক বিচিত্রতার ভাব কিছু থাকে না। পার্থিব বস্তুর বিচিত্রতা অনন্তে ডুবিয়া যায়। সুতরাং ব্রহ্ম-বিধান নূতন পুরাতন, দিবা-রাত্রি, সময় ও কালের অতীত নিত্য। সে আবার আজ নূতন, কাল পুরাতন এ কেমন কথা! ঈশ্বরের বিধান যে অপরিবর্ত্তনীয়, নূতন হইবে কিরূপে?

শশিবাবু। আপনি নূতন বিধান সম্বন্ধীয় যে সকল যুক্তি প্রদর্শন করিলেন, ইহা অতি নীরস। কারণ, প্রকৃতিকে একবারে ছাড়িয়া দিলে ত কিছুই থাকে না। প্রকৃতিপুঞ্জ অর্থাৎ স্থূল তত্ত্বের ভিতরে যে নূতন পুরাতন দেখা যায় একি ঐশী শক্তির অতীত?

কমলাকান্ত। তবে আপনারা নিরাকার বলিয়া অত চীৎকার করেন কেন? পরিমিত স্থূল তত্ত্বের বিকার-বৈচিত্রভাব, ইহাই ত (একেশ্বরবাদ) ব্রাহ্মধর্ম্মের বিরোধী। বলিতে কি, মহামনস্বীগণও উহার দ্বারা জগৎ প্রপঞ্চের ভীষণ তরঙ্গে নিমজ্জিত হন। নিশ্চয়ই বুঝিবেন, ব্রহ্ম-বিধান কালাতীত অনন্ত সত্বাশ্রিত অপরিবর্ত্তনীয় নিত্য।

নূতন পুরাতনের বিচিত্রতাই ব্রহ্মদর্শনের আবরণ, উহাকে পরিত্যাগ করিতে পারিলেই ত সিদ্ধি।

শশিবাবু। যাক্, আমার আর অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই। আচার্য্যদেব কর্ত্তৃক মাতৃভাবে উপাসনা, হৃদয়ে প্রত্যাদেশ, সকলপ্রকার ধর্ম্মের সমন্বয় এ সকল কি আপনি নূতন বিধানের অঙ্গীভূত বলিয়া স্বীকার করিবেন না। আচার্য্য-মুখ-নিঃসৃত জ্বলন্ত উপদেশ সমূহ যাহা প্রকাশ হইয়াছে, ঐ সকল কথা, কোথাও শুনিয়াছেন? তবেই বলিতে হয়, নূতন বিধানবাদ সম্বন্ধে প্রতিবাদ করা একটুকু বিবেচনা সাপেক্ষ।

কমলাকান্ত। অটল প্রতিভ আচার্য্য, উনি সমান্য ব্যক্তি ছিলেন না। তাঁহাকে ভগবানের বিশ্বাসী ভক্ত আদর্শ পুরুষ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, কিন্তু সত্যের অনুরোধে যাহা প্রাণে বলিতে চায়, তাহা কেন বলিব না? নিত্য বিশ্বাস মূলে জগৎ এক পক্ষ হইলই বা ভয়ের কথা কি? আপনি বিধানে নূতনত্ব ভাবের যে সকল কথা বলিলেন, তাহার মধ্যে একটাকেও নূতন বলিতে পারা যায় না। হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান প্রভৃতি সকল প্রকার সম্প্রদায় মধ্যে (একেশ্বরবাদ) ব্রাহ্মধর্ম্ম রহিয়াছে পরস্পর সাধকগণ তাহারই জন্য লালায়িত। মাতৃ-ভাবে পূজার প্রথা হিন্দু সমাজে অতি প্রাচীন কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। তাঁহারা কোন একটি মাতৃ-মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া পূজা করেন এবং নিরাকার ভাবেও ভাবিয়াছেন, "যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শক্তিরূপেন সংস্থিতা" একেশ্বরবাদীরাও নিরাকার মাতৃ-ভাবে অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। ব্রহ্ম ক্লীব লিঙ্গ, পিতৃ-মাতৃভাবে জড়িত। সুতরাং মাতৃ-ভাবে উপাসনা করা নূতন কথা কি? ব্যাকুলভাবে পড়িয়া থাকিলে মনের বিশ্বাস ও দৃঢ়তা নিবন্ধন হৃদয়ে আদেশ প্রকাশ হয়। আর যদি বিবেককেই ব্রহ্মাদেশ বুঝেন, তবে নানকে দেখুন—"অনাহত ভেরী বাজেরে"—থিওডোর পার্কারকেও মনে করুন। (একেশ্বরবাদ) উদার ব্রাহ্মধর্ম্মের দ্বারা

সামাজিকতার ঘোর অন্ধকারকে বিনষ্ট করা, উহাই ধর্ম্মের সার ও সমন্বয়। জাত্যভিমানের আবরণ ঘুচিয়া গেলে মহাজ্ঞানের আবির্ভাব হয়। তৎসঙ্গে নিরাকার নিত্য চৈতন্যের নিত্য বিধানের অখণ্ড আলো ফুটিয়া উঠে। মানুষ জগত-তত্ত্বের বিচিত্রতার ভিতরেও এক অসীম মহাশক্তির ভিতরেই স্থিতি করিতেছে, ইহা না বুঝিয়া স্থূলের অন্তরালে নূতনত্ব মনে করে, কিন্তু অসীম নিরাময় নিত্য পুরুষের প্রতি জ্যোতি-শ্চক্ষু পড়িলে আর সেরূপ ভ্রম-দৃষ্টি থাকে না। ভক্তগণ ভাবুকতার উত্তাল-তরঙ্গে পড়িয়া "নব-হরি", "নব-ব্রহ্ম" "নিত্য-নূতন" পর্য্যন্ত বলিয়া থাকেন। সুতরাং অভ্রান্ত সত্য হৃদয়ে গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন না।

শশিবাবু। আপনি বেদান্ত-দর্শনের ছায়া ধরিয়া জড় জগতকে একবারে কিছুই নয় ভাবিতেছেন, এটা কি প্রকৃত মীমাংসার কথা! সাঙ্খ্য, পাতঞ্জল, বৈশেষিক প্রভৃতি দর্শন শাস্ত্রের কোন কোন অংশে সাকারবাদের ভিতরেও ত ব্রহ্ম-মীমাংসা শুনা যায়। এক বেদান্ত-দর্শনেই যে ঈশ্বর-তত্ত্বের মীমাংসা শেষ হইল তাহাও ত বিশ্বাস করা যায় না।

কমলাকান্ত। এ প্রশ্নের উত্তর এক কথাতেই হইতে পারে। ঈশ্বর নিরাকার অনন্ত শক্তি সম্পন্ন বলিয়া যদি বিশ্বাস হয়, তবে স্থূল জগতের অস্তিত্ব অনন্তের অনন্ত সত্ত্বাকে স্পর্শও করিতে পারে না। ভৌতিক পদার্থের পরিমিত দর্শন যখন কিছুতেই বিদূরিত হয় না, তখন উপলখণ্ডবৎ সসীম জগতে অসীম মহাশক্তিকে গ্রহণ করিবে কিরূপে? বুদ্বুদের ন্যায় ডুবিয়া যায় না কি? সুতরাং বেদান্ত-দর্শনের ব্রহ্ম-বিচার সর্ব্ববাদীসম্মত। স্থূল জগৎ-সমূহও এক মহাশক্তির ভিতরে স্থিতি করিতেছে সত্য, কিন্তু উহা বিশ্ব-লীলার উপযোগী সত্ত্বেও বিকার বশতঃ মোহ ভ্রান্তি, আসক্তিকে প্রবল করে, এই কারণে যোগিগণ উহা হইতে দূরে অবস্থিতি করেন।

এইরূপ অনেক প্রকার ধর্ম্মালোচনায় সন্ধ্যা হইয়া গেল। কমলাকান্ত ও শশিবাবু উভয়েই বাসায় উপস্থিত হইলেন। কমলাকান্ত নব-বিধান সমাজের মত বিরুদ্ধ আলোচনা করা সত্ত্বেও তাঁহাকে শ্রদ্ধেয় বঙ্গচন্দ্র রায় উপাচার্য্য, শ্রদ্ধেয় দুর্গাদাস রায়, শ্রদ্ধেয় ঈশানচন্দ্র সেন প্রভৃতি ইহাঁরা প্রাণের সহিত ভালবাসেন, আহা! কি উদার ভাব। সর্ব্বদা তত্ত্ব লইতে কেহই ক্রটী করেন না। কমলাকান্ত প্রতিদিন উপাসনার সময় রীতিমত যোগ দিতেন এবং শ্রদ্ধেয় দুর্গানাথ বাবুর সঙ্গীত শুনিয়া বড় প্রীত হইতেন।

কমলাকান্ত ঢাকায় নব-বিধান সমাজের সাধুসঙ্গ দ্বারা আপনাকে ধন্য বোধ করিলেন। ধুলিয়ানে কিছু কার্য্য হইবে বুঝিতে পারিয়া যাইবার জন্য শশিবাবুকে জানাইলেন। শশিবাবু তাঁহার আন্তরিক ভাব বুঝিয়া বিশেষ অনুরোধ করিলেন না; এইমাত্র বলিলেন, দেখুন, কোনরূপ ক্ষতির কার্য্য হইলে আবদ্ধ করা উচিত হয় না। কমলাকান্ত প্রত্যূষে বন্ধুগণের নিকট বিদায় লইয়া কতক পথ গয়নার নৌকায়, কতক পথ পাদচারে ভ্রমণ প্রচার, অবশিষ্ট রেলপথে বাড়ী আসিলেন। ঢাকার বন্ধুগণই তাঁহাকে ব্রহ্মদাস উপাধি প্রদান করেন।

এখানে নন্দবাবু একাকী থাকিয়াও একেশ্বরবাদ ধর্ম্মের জ্বলন্ত বিশ্বাসে বিচলিত হন নাই। অচল সদৃশ স্থির ধীরভাবে উপাসনা প্রার্থনা করিতেন, একটী দিনের জন্যও বীতশ্রদ্ধ ভাব কেহ দেখেন নাই। অবসর পাইলেই তিনি নির্জ্জন চিন্তায় ব্রহ্মানন্দ ভোগ করিতেন। সময়ে সময়ে চিকিৎসা উপলক্ষে প্রচার করিতেও ক্ষান্ত থাকিতেন না অনেক দিনের পর কমলাকান্তকে পাইয়া বড় আহ্লাদিত হইলেন। ব্রহ্মদাস কমলাকান্ত আশ্রমে আসিয়াই ঢাকার সমস্ত বৃত্তান্ত বলেন, ক্রমে ক্রমে নব-বিধান সম্বন্ধে তাঁহারও সন্দেহ উপস্থিত হয়। সুতরাং উভয়ের একমত হওয়াতে উৎসাহ, উদ্যম, তৎপরতা আরও বৃদ্ধি হইয়া

উঠিল। অধিকাংশ সময় তাঁহারা ঐ বিধান বিষয়েরই আলোচনা করিতেন।

এই সময় ব্রহ্মদাস কমলাকান্ত একটী কার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন। কার্য্যটী এই—ধুলিয়ান বন্দরের স্থানে স্থানে বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করিলেন এবং বিনামূল্যে নিজের রচিত পুস্তক বিতরণ করিতে লাগিলেন। নিকটবর্ত্তী গ্রামের ব্যক্তি বিশেষের বাড়ীতে মধ্যে মধ্যে আপনা হইতে যাইয়া উপাসনা প্রার্থনা করেন এবং খোল করতাল সংগ্রহ পূর্ব্বক স্বরচিত কীর্ত্তন-সঙ্গীত করিতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপ প্রচারভাবে কতকগুলি লোক জুটিয়া গেল। এমন কি, একদিন উপাসনা কীর্ত্তন বন্ধ হইলে সকলেই ব্যাকুল হইতেন। ধুলিয়ানের অদূরে সাঁকোপাড়া গ্রামের হরিপ্রসাদ কর্ম্মকার, বঙ্কবিহারী কর্ম্মকার, শশিভূষণ কর্ম্মকার, নবীনচন্দ্র সূত্রধর ও হারাধন সূত্রধর প্রভৃতি ইহাঁরা উপাসনা কীর্ত্তনে বড়ই উন্মত্ত হইলেন। কমলাকান্ত তাঁহার রচিত প্রবন্ধের পাণ্ডুলিপি সকলের কাছে পাঠ করিয়া একেশ্বরবাদ ধর্ম্মের তত্ত্ব বুঝাইতে লাগিলেন। উপাসনা পদ্ধতি নিজের উপাসনা দ্বারা পরস্পরকে শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেন।

নন্দবাবু এই সমস্ত কথা শুনিয়া কমলাকান্তকে বলিলেন, দেখুন, এখন একখানি ঘরের প্রয়োজন হইতেছে, শীঘ্রই ধুলিয়ানে ব্রাহ্মসমাজ হওয়া একান্ত প্রয়োজনীয়। অমৃতলাল সাহা, মাণিকচন্দ্র কর্ম্মকার ইহাঁদের ইচ্ছা যে যত শীঘ্র একখানি ঘর প্রস্তুত হয়। কমলাকান্ত প্রীতি সহকারে বলিলেন, ডাক্তারবাবু! আমি পূর্ব্বেই আভাস পাইয়াছি, প্রভুর ইচ্ছা পূর্ণ হউক।

১২৯৪ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে একদিন ব্রহ্মদাস শ্রীনাথ রায় চৌধুরীর বাড়ীতে বেড়াইতে যান। ব্রাহ্মধর্ম্মের বিবিধ প্রসঙ্গের পর তিনি শ্রীনাথ রায় চৌধুরীকে বলিলেন, "দাদা! এখন একখানি ঘরের বড়

প্রয়োজন হইয়া উঠিল—আপনার সাঁকোপাড়া মহালেরই ত মেম্বর অধিক বলিতে হয়। অতএব আপনি একখানি ঘরের সাহায্য করুন।” রায় চৌধুরী সন্তুষ্ট চিত্তে অঙ্গুলি সঙ্কেতে দেখাইলেন, “ঐ যে চৌবাড়ী ঘরের চাল চারিখানি সাজান রহিয়াছে উহা দ্বারা সমাজের কার্য্য হইতে পারে কি ?”

ব্রহ্মদাস বলিলেন, “হাঁ, কিছু ছোট করিয়া লইলে বেশ হইবে, কিন্তু আরও কিছু বাঁশের সাহায্য করিবেন। শ্রীনাথ বাবু ঘরের অভাব পূরণ করিবেন বলিয়া স্বীকার করিলেন। ভগবানের ইচ্ছায় অনেকেরই নিকটে কিছু কিছু সাহায্য পাওয়া গেল। ঘরের চাল চারিখানি বাঁধা শেষ হইল—কোথায় যে ঘর উঠিবে তাহার বিন্দু বিসর্গও ঠিক নাই।

ব্রহ্মদাস ধুলিয়ানে গিয়া নন্দবাবুকে বলিলেন, ঘরের চাল বাঁধা ত শেষ হইল, এখন উঠান যায় কোথায় ? নন্দবাবু কিছুকাল স্তম্ভিত ভাবে রহিলেন, আর বিলম্ব না করিয়া তাঁহারা ধুলিয়ান বন্দরের অনেক স্থানে ভ্রমণ করিলেন, কোথাও একটুকু স্থান পাইলেন না। যাহা হউক, মহানন্দ স্বর্ণকার নামক একজন গৃহস্থ ব্যক্তির বাড়ীর পশ্চিম দিকে কতকটা জায়গা ছিল, তাঁহার ঐ স্থানটুকুর জন্য অনুরোধ করা হইল। মহানন্দ স্বর্ণকারের সম্যক প্রকার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু তাঁহার শ্বাশুড়ীর অনুরোধে অগত্যা তিনি স্বীকার করিলেন। অল্প সময়ের মধ্যে সমাজ-ঘর উঠিয়া গেল।

আষাঢ় মাসের প্রথমেই সমাজ-গৃহের সমস্ত কার্য্য শেষ হইয়া গেল। ২০শে আষাঢ় মন্দির-প্রতিষ্ঠার দিন ধার্য্য হইল, মেম্বরগণ তাহারই উদ্যোগে প্রবৃত্ত হইলেন। পরম মঙ্গলময় পরমেশ্বরের কি অপার কৃপা! ঐ সময় সুখময় হালদার মহাশয় কোন কার্য্য বশতঃ স্বর্গীয় সম্ভ্রান্ত জমিদার জগদ্বন্ধু রায় চৌধুরীর বাড়ীতে উপস্থিত ছিলেন। বন্ধুগণ তাঁহার দ্বারা মন্দির প্রতিষ্ঠার কার্য্য নির্ব্বাহ করিলেন। উপাসনা,

প্রার্থনা, কীর্ত্তন বেশ জমাটভাবে হইয়াছিল। এই মন্দির প্রতিষ্ঠায় নন্দলাল পাল ডাক্তার, কৈলাসচন্দ্র চক্রবর্ত্তী পোষ্ট মাষ্টার, গঙ্গাচরণ ঘোষ প্রভৃতি সকলেই প্রাণের সহিত যোগ দিয়াছিলেন। তখন হইতে সাপ্তাহিক উপাসনা চলিতে আরম্ভ হইল। মহানন্দ স্বর্ণকার ভগবৎ-প্রেমে একান্ত অনুরক্ত হইয়া, প্রতি সাপ্তাহিক উপাসনার দিনে আনন্দ ভরে সকলকে সন্দেশ ভোজন করাইতে লাগিলেন, কিন্তু মেম্বরগণ সে প্রথাটী ভাল বিবেচনা করিলেন না। মহানন্দ স্বর্ণকারকে সন্তোষজনক উপদেশ দিয়া উটি বন্ধ করিলেন।

একদিন সাপ্তাহিক সমিতিতে অনেক বন্ধুগণ উপস্থিত ছিলেন। ব্রহ্মদাস প্রথমতঃ প্রশ্ন উত্থাপন করেন যে, নব-বিধান সম্বন্ধে আপনা-দিগের মত কি? সুখময় হালদার মহাশয় স্পষ্টই বলিলেন, "নব-বিধান মতটি যেন আমার মতে অসম্ভব। কেননা, ঈশ্বর নিরাকার নিত্য, অনন্তব্যাপী, তাঁহার বিধানও অপরিবর্ত্তনীয়। মানুষ জড় জগতের বিচিত্রতার মধ্যে নূতন পুরাতন দেখে, এটি ভ্রান্তি বলিয়াই যেন আমার মনে হয়।" গঙ্গাচরণ বাবু তিনিও তাঁহার মতেই মত দিলেন। নন্দ-বাবু পূর্ব্ব বিশ্বাস মতে ঐ কথাই পুনরাবৃত্তি করিলেন মাত্র। সেই অবধি একখানি রক্তবর্ণের চতুষ্কোণ বস্ত্র খণ্ডে "সত্য-বিধান" এই কথাটী দিয়া মন্দিরের প্রকাশ্য স্থানে রাখা হইল এবং শিল্পাক্ষরে "ব্রহ্মকৃপাহি কেবলম্" ইত্যাদি অনেকগুলি নিশান প্রস্তুত হইল। গেটের এক পার্শ্বে কাষ্ঠফলকে একটী সাইনবোর্ড দেওয়া হইল। সেই সময় ধুলিয়ান ব্রাহ্মসমাজের যে সকল নিয়ম স্থির হইয়াছিল, তাহাও এখানে অবিকল বিবৃত করা গেল।

১। এই সমিতির উপাস্য পরমাত্মাই গুরু বা আচার্য্য বলিয়া স্বীকৃত। সুতরাং কোন উপাসককে আচার্য্য বা উপাচার্য্য বলিয়া অভিহিত করা হয় না ও হইবে না এবং বেদীও নাই, ও থাকিবেও না।

সকল উপাসকই ভ্রাতৃভাবে সমাগত হইলে প্রত্যেকেই সমাসনে উপাসনা করিতে এবং পরস্পরকে বা মণ্ডলীকে উপদেশ দিতে অধিকারী।

২। ইহাতে সর্ব্বাশ্রয় দয়াল পিতাকে স্বরূপতঃ উপাসনা, ধ্যান, ধারণাদি করা অর্থাৎ পর ব্যোম-ব্যাপী পরব্রহ্মেরই পূজা হইবে। সুতরাং উপাসনাদিতে সকল প্রকার ভ্রমোৎপাদক চরণাদি প্রত্যঙ্গ কল্পনা ব্যবহার করা হইবে না।

৩। যাঁহারা পরমাত্মাকে উক্তরূপে উপাসনা করেন এবং কোন প্রকার সাকার অনুষ্ঠানে যোগ দিবেন না, তাঁহারাই এই সমাজের ভ্রাতা বলিয়া গণ্য হইবেন।

৪। যে সকল পরিবারে ঐরূপ উপাসনাদি হইবে এবং কোন প্রকার কাল্পনিক উপাসনা হইবে না সেই সকল পরিবার 'ব্রহ্ম-পরিবার' নামে অভিহিত হইবে।

৫। যে কোন ব্যক্তি হউন, উক্তরূপ প্রবৃত্তি লইয়া উপাসনায় যোগ দিতে পারেন।

৬। প্রত্যেক ব্যক্তির স্বাধীনতা স্বীকৃত। স্ত্রী ও স্বামীতে পরস্পর যদি ধর্ম্ম-বিশ্বাসে অনৈক্য হয়, তাহা হইলে ঈশ্বরের বিধান সত্ত্বে কেহ কাহাকে পরিত্যাগ করিতে পারিবে না। কিন্তু স্ত্রী যদি স্বাধীনা হইয়া অন্য পুরুষে অনুরক্ত হন, এরূপ অবস্থায় ঐরূপ স্বাধীনা স্ত্রী স্বামীর পরিত্যাজ্য এবং ঐরূপ স্বাধীন স্বামীও স্ত্রী কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইতে পারেন।

৭। যদি কোন পরিবার মধ্যে স্ত্রী কি স্বামী, কন্যা কি পুত্র অথবা কোনপ্রকার সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি সাকার পূজার অনুষ্ঠান করেন, তাহা হইলে ঐ পরিবারের যে কোন ব্যক্তি তাহাতে নিয়ত নির্ব্বিকার হইয়া নির্লিপ্ত থাকিবেন। তিনি ব্রাহ্মসমাজের ভ্রাতা বলিয়া গৃহীত হইতে পারেন।

৮। যাঁহারা এই সমিতির সহিত সতত যোগ দিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের লইয়া একটী মণ্ডলী গঠিত হইলে ঐ মণ্ডলীর (কংগ্রেসের) মঙ্গল উদ্দেশ্যে প্রতি বুধবার তাঁহাদের অধিবেশন হইবে।

৯। সমিতির ভ্রাতৃগণ দ্বারা একটী (কমিটি) বা সভা স্থাপিত হইবে। ঐ কমিটিরঅধীনে এই ধুলিয়ান ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যভার ন্যস্ত থাকিবে। ইহার অধিবেশন প্রতি মাসে একদিন করিয়া হইবে। এই অধিবেশনে গভীর ধ্যানপরায়ণ হইয়া আলোচ্য বিষয়ে পিতা হইতে আলো পাইবার জন্য প্রার্থনান্তর অধিকাংশের মতে কার্য্য হইবে।

১০। যে সকল সঙ্গীতে চরণাদি প্রত্যঙ্গের কল্পনা নাই, সেই সকল সঙ্গীতই গীত হইবে।

১১। উপাসকমণ্ডলীর ভ্রাতৃগণের চরিত্র সর্ব্বতোভাবে পবিত্র ও নিষ্কলঙ্ক হওয়া চাই।

১২। কি পরিবার মধ্যে, কি প্রতিবেশীমণ্ডলে, কি গ্রামে, কি গ্রামান্তরে, ব্রাহ্মসমাজের ভ্রাতৃগণের নিত্য ধর্ম্মের সত্য সকল, অন্ততঃ সুবিধামত প্রচার করা একটা কর্ত্তব্য কার্য্যের মধ্যে গণ্য।

ধুলিয়ান ব্রাহ্মসমাজের ভ্রাতৃগণ উপর্য্যুক্ত নিয়মাবলীর বশবর্ত্তী হইয়া সুশৃঙ্খলামত কার্য্য সম্পন্ন করিতে লাগিলেন। রবিবার সাপ্তাহিক সমিতির দিনে সকলেই আসিয়া যোগ দেন ও উদ্যমের সহিত উপাসনা করেন; দুঃখের বিষয় সুখময় হালদার মহাশয় এখান হইতে চলিয়া গেলেন। তিনি গেলেও সভা-সমিতি, উপাসনা, কীর্ত্তনাদি বেশ চলিতে লাগিল। এখানে যে সকল ব্যক্তির প্রাণের ভিতরে বীতশ্রদ্ধ ভাব ছিল, তাঁহাদের মধ্যে অনেকের সে ভাব অপনীত হইয়া গেল, তাঁহারা প্রতি রবিবার সমাজে আসিয়া যোগ দিতে লাগিলেন। আবার কতকগুলি লোক "বিষকুম্ভ পয়োমুখ" এরূপ ভাবেও সমাজের বিঘ্ন সংঘটন জন্য উদাসীন রহিলেন না। একদল তরুণ যুবক একজোট

হইয়া অনিষ্ট চিন্তা করিতে ত্রুটী করেন নাই, যুবকেরা অনেক সময় ব্রহ্মদাস বক্তৃতার মধ্যে ঘৃণিত ভাষায় গালি দেন ইত্যাদি ষোল আনা মিথ্যা কথা আরোপ করিয়া স্থানীয় জমীদারের নিকট অভিযোগ উপস্থিত করেন, ফলতঃ অসত্য টেঁকে না, তাঁহারা কিছু করিতে পারিলেন না, কিন্তু অনিষ্ট করিতেও ত্রুটী করেন নাই।

কমলাকান্তের প্রতি যুবক দলের অত্যাচার বেশী, এজন্য অনেক প্রকার বিপদ ঘটনা তাঁহার মাথার উপরে চলিয়া যায়, একদিনের একটী ঘটনার বিষয় বলিতেছি। কমলাকান্ত ও গঙ্গাচরণ ঘোষ এক গ্রামে বাস করেন, যাতায়াতও একসঙ্গেই হয়, মাস ও তারিখ জানা নাই, তাঁহারা রবিবারের সমিতিতে ধুলিয়ানে আসিয়াছিলেন। উপাসনা শেষ হইলে গঙ্গাচরণবাবু বলিলেন, "তবে এখন চলুন, রাত্রি ক্রমে বেশী হইতেছে।" কমলাকান্ত কিঞ্চিৎ মৌনভাবে থাকিয়া উত্তর দিলেন, "আজ আপনি একাই যান, আমি যাইব না," এই বলিয়া তিনি সেই রাত্রে ধুলিয়ানে অবস্থিতি করিলেন, গঙ্গাচরণ বাবু অগত্যা একাই চলিয়া গেলেন।

পরদিন জানা গেল, ঐ অশিক্ষিত যুবকদল মধ্যে কয়েকটী তরুণ যুবক ব্রহ্মদাসের বাড়ী যাইবার রাস্তায় এক নিভৃত পার্শ্বে তাঁহাকে পাইলেই মারিবেন বলিয়া প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিতি করিতেছিলেন, কিন্তু বিধাতা সে সাধ পূর্ণ করিতে দিলেন না; তাঁহারা বিফল মনোরথ হইয়া আপনাপন বাড়ী গেলেন। পরদিন কমলাকান্ত এই কথাটী কোন আত্মীয় ব্যক্তির নিকট শুনিয়া আনন্দভরে গঙ্গাচরণ বাবুকে বলিলেন, "প্রভু প্রত্যক্ষই হৃদয়ে আছেন, পূর্ব্বেই যেন একটু ইঙ্গিত জানাইয়াছিলেন, ধন্য তাঁহার কৃপা!" সেইদিন হইতে কমলাকান্তের প্রাণের ভিতরে উৎসাহ, উদ্যম জ্বলন্তভাবে জাগিয়া উঠিল। একটী নিয়ম উদ্ভাবন করিলেন যে, বিরুদ্ধাচারীর দলপতিকে 'অগ্রে নমস্কার করা।' কমলাকান্তের বয়ঃক্রম অধিক, বিরুদ্ধাচারীর দলাধ্যক্ষ যুবক, সুতরাং

এই প্রথাটিতে অনেকেরই মন্দ ব্যবহার প্রায় কমিয়া গেল। অগ্রে নমস্কার করিলে জিত হইবে, পরস্পরের ইহা একটী কার্য্য হইল। ইহাতে এই ফল দাঁড়াইল যে, অল্প সময়েই নমস্কারের ঘনাঘনিতে উভয়ের ভালবাসা ঘনীভূত হইয়া উঠিল।

কমলাকান্ত এই প্রথানুবর্ত্তী হইয়া মুসলমান সমাজেও বড় প্রীতি পাইতে লাগিলেন। প্রায় প্রতি (জুম্মায়) শুক্রবারে মস্‌জিদে গিয়া যোগ দিতেন। নেমাজ শেষ হইলে খোদার নিকট প্রার্থনা করিয়া পরিশেষে কিছু কিছু ধর্ম্মকথা বলিতেন। একেশ্বরবাদী মুসলমানগণ তাঁহাকে পরস্পর আপনার একজন আত্মীয় বলিয়া আদর করিতেন। ইদের সময় এ প্রদেশে একটী সুবিস্তৃত প্রান্তরে কোন বাগানে বহু লোকের সমাগম হয়। সেখানেও তিনি তাঁহাদের সঙ্গে যোগ দিতেন। নেমাজ সম্পন্ন হইলে সময়োচিত একটী প্রাণস্পর্শী বক্তৃতা করিতেন। ইহাতে প্রদেশস্থ মুসলমান বন্ধুগণ তাঁহাকে বড় ভালবাসিতেন, কোন দিন মুসলমান পল্লীতে রাত্রি হইলে, সঙ্গে লোক দিবার জন্য যদি কেহ অনুরোধ করিতেন, তিনি বলিতেন, "খোদা রক্ষা করিলে ভয়ের ত কোন কথাই নাই," এই বলিয়া একাই বাড়ী আসিতেন। ব্রহ্মদাসের এইরূপ আনুগত্য ব্যবহারে মুসলমানেরাও রবিবারে সাপ্তাহিক সমিতিতে যোগ দিতেন।

ধুলিয়ান ব্রাহ্মসমাজের চতুর্থ সাম্বৎসরিক উৎসবের দিন অতি অল্প বুঝিয়া কমলাকান্ত রবিবার সাপ্তাহিক সমিতিতে সভ্যগণের নিকট দুইটী কার্য্য সম্বন্ধে অনুরোধ করিলেন। গঙ্গাচরণ ঘোষ, নন্দলাল পাল, কৈলাসচন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি সকলেই সন্তোষের সহিত বলিলেন, এ সম্বন্ধে অধিক ব্যয় হইলেও উৎসবের শেষে দীন দুঃখীদিগকে এক একখানি কাপড় ও কিছু কিছু চাউল দিয়া বিদায় করিতে হইবে। কমলাকান্ত সেই সময় আরও একটী মত জিজ্ঞাসা করিলেন।

কোন সময় নলহাটীর ষ্টেশন ঘরে শ্রদ্ধেয় বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ও শ্রদ্ধেয় নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহোদয়গণকে শ্রীনাথ বাবু ধুলিয়ানের উৎসবে আসিবার জন্য অনুরোধ করেন। তৎসম্বন্ধীয় সমস্ত ব্যয় ভার তিনি গ্রহণ করিবেন, আপনারা এ বিষয়ে কি বলেন। শ্রদ্ধেয় নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে আনিবার জন্য সকলেরই মত হইল, তখনই মণি-অর্ডারে পাথেয় ও স্বতন্ত্র চিঠি পাঠান হইল। উৎসবের আয়োজনে সকলে প্রবৃত্ত হইলেন, মন্দিরের মধ্যে পুষ্প-পল্লব সহিত কাঁচের ঘট কিম্বা সম্মুখে ঈশ্বরের বসিবার সিংহাসন, এমন কি, উপাসকের জন্য স্বতন্ত্র আসনও রাখা হইবে না; উপাসক সমাসনে বসিয়া উপাসনা করিবেন একখান ব্রহ্ম-সঙ্গীত পুস্তক এক পার্শ্বে থাকিবে মাত্র।

১২৯৫ সালের কার্ত্তিক মাসের ১৩ই তারিখে শ্রদ্ধেয় নগেন্দ্রবাবু ধুলিয়ানে উপস্থিত হন। ১৪ই ১৫ই ১৬ই এই তিন দিন উৎসবের নিয়ম ছিল। নিমন্ত্রিত হিন্দু মধ্যে সদাশয় ব্যক্তি মাত্রেই আইসেন এবং মুসলমান বন্ধুরা অনেকেই আনন্দের সহিত যোগ দিয়াছিলেন। মুর্শিদাবাদ হইতে শ্রদ্ধেয় রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ডাক্তার মহাশয় আসিয়া উৎসব ব্যাপারে যথেষ্ট পরিশ্রম করেন। প্রোগ্রাম মত উপাসনা, প্রার্থনা, উপদেশ, জলন্তভাবে সম্পাদিত হয়। শেষ দিন দুঃখী বিদায়ের পর সন্ধ্যার প্রাক্কালে ধুলিয়ান বন্দরে রাজার বাজারে কীর্ত্তন ও বক্তৃতা অতি সুন্দর হইয়াছিল। উৎসব শেষ হইয়া গেলে শ্রীনাথ রায় চৌধুরী নগেন্দ্রবাবু প্রভৃতিকে বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করিয়া প্রীতি-ভোজন করাইলেন, তাঁহার আনুগত্য ও সহানুভূতিতে সকলে আহ্লাদিত হন। শ্রদ্ধেয় নগেন্দ্রবাবু কয়েকদিন পরে কলিকাতায় চলিয়া গেলেন।

ইতিপূর্ব্বে কমলাকান্ত অনেকগুলি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে "বাক্তি-দর্শন" ও "অদ্বৈতভাব" এই প্রবন্ধ দুইটী ক্ষুদ্রাকারে মুদ্রিত হয়। ঐ পুস্তক দুইখানি অল্পমূল্যে বিক্রয় ও ব্যক্তি বিশেষে বিতরণ

করিয়া জনসমাজে প্রচার আরম্ভ করিলেন; তখন হইতে বক্তৃতা করা একবারে পরিত্যক্ত হইল, কেননা, সেই সময় তাঁহার বুকে হঠাৎ একটা বেদনা উপস্থিত হয়, তজ্জন্য ডাক্তারেরা অমিত পরিশ্রম ও বক্তৃতা করিতে একবারে নিষেধ করেন; সুতরাং পুস্তক মুদ্রিত করিয়া এবং আলোচনার ভিতরে যতটুকু ধর্ম্মমত প্রচার হয়, তাহাই করিতে বাধ্য হইলেন। কমলাকান্ত বহুদেশ দর্শী নহেন, অল্প স্থানেই ভ্রমণ করিয়াছেন। অধিকাংশ সময় রামপুরহাট, নলহাটী যাইতেন, তথাকার বন্ধুগণ তাঁহাকে বড় শ্রদ্ধা করিতেন। রামপুরহাটের শ্রদ্ধেয় পূর্ণচন্দ্র দাস মহাশয় প্রভৃতি এবং নলহাটীর বন্ধুগণের সহিত ধর্ম্মানুগত্যে বড় তৃপ্তি পান। সেই সময় শ্রদ্ধেয় নীলকান্ত সিদ্ধান্ত, প্রমথনাথ সরকার, কুঞ্জলাল ঘোষ মহোদয়দিগের উপাসনার পদ্ধতির অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছিল। উপাসনার ভিতরে কোন প্রকার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কল্পনার ছায়া পড়িতে দিতেন না; আচার্য্য ভাবটাও যেন অল্প সময়েই চলিয়া গেল। সম্মুখে নিরাকার চিন্তায় বাধা দেয়, এমন কোন দ্রব্যাদি রাখিতেন না। এমন কি, নলহাটী ব্রাহ্মসমাজ হইতে "ভাষায় পৌত্তলিকতা" নামে একটী প্রাণস্পর্শী প্রবন্ধও প্রকাশিত হয়।

একবার রামপুরহাটের উৎসবে শ্রদ্ধেয় শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় আইসেন। উৎসব উপলক্ষে সেখানে কমলাকান্তও উপস্থিত ছিলেন। শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রাণস্পর্শী উপাসনা ও জ্বলন্ত উপদেশে সকলেই মোহিত হইয়াছিলেন। কিন্তু কমলাকান্তের নিরাকার-ভাবের দিকেই বড় বেশী ঝোঁক। বলিতে কি, বিন্দুমাত্র কোনওপ্রকার স্থূলের ছায়া পড়িলে আর কি রক্ষা আছে! শাস্ত্রী মহাশয় প্রার্থনার মধ্যে অনেক বার "হে প্রভো! তোমার চরণাঙ্গুলিতে একটু স্থান দাও।" বলিয়াছিলেন, ঐ কথাটিতে তাঁহার প্রাণে বড়ই আঘাত লাগিয়াছিল। সুতরাং রাত্রিতে তাঁহাকে নির্জ্জনে পাইয়া কথাটী বলিলেন। শাস্ত্রী

মহাশয় তাহার এই উত্তর দিয়াছিলেন যে, "ওটা অভ্যাসগত ভাষা, অবশ্যই দোষের কথা!" এককথাতেই মীমাংসা করিয়া দিলেন। সে রাত্রি অনেক সময় পর্য্যন্ত কমলাকান্তের সহিত ধর্ম্মালোচনা হয়। অনেক প্রকার গভীর তত্ত্ব লইয়া তাঁহারা আনন্দ সম্ভোগ করেন। শাস্ত্রী মহাশয় কমলাকান্তকে দেখিলেই "অবধূতব্রাহ্ম" বলিয়া সম্বোধন করিতেন, কমলাকান্ত উত্তর দিতেন, "আমি নিশ্চয় একটী আদত ভূত ব্রাহ্ম।" কয়দিন বড় রগড় চলিল, এই উৎসবেই তিনি শ্রদ্ধেয় নগেন্দ্র বাবুর সহিত প্রথম পরিচিত হন।

---

# সপ্তম পরিচ্ছেদ।

ধুলিয়ান ব্রাহ্মসমাজে কমলাকান্ত প্রথমাবস্থায় যে সকল ধর্ম্মতত্ত্বের আলোচনা করেন এবং ঐ সমূহ আলোচনায় যে সকল প্রশ্ন উপস্থিত হয়, তদুত্তরে তিনি যাহা বলেন, তাহার মধ্যে আমরা কয়েকটী বিষয়ের অবিকল উল্লেখ করিব। মানব-জীবন কোন পথ দিয়া কি ভাবে অল্প সময়ে গঠিত হয়, কমলাকান্তের জীবনী তাহার একটী অদ্ভুত নমুনা। ইনি সংস্কৃত পড়েন নাই, কোন শাস্ত্র দেখেন নাই, কিন্তু তাঁহার কথাগুলি একটু শুনিবার কথা!

**নির্লিপ্ত ভাব**—"সকলেই বলিয়া থাকেন, পার্থিব সুখৈশ্বর্য্য ঈশ্বরই দেন, তবে বিভব-সম্ভোগে উদাসীন থাকা কেন? এ কথার মূলে একটুকু চিন্তা করিলে বুঝা যায় যে, পার্থিব ঐশ্বর্য্যাদির মধ্যে ঈশ্বর আছেন সত্য, অথচ নির্লিপ্ত। ষড়ৈশ্বর্য্যময় ভগবানের অনন্ত প্রসার অচিন্ত্য শক্তি যাঁহার সর্ব্বাধারে প্রকাশ পাইতেছে এবং তীব্র ও মধুর প্রভৃতি সমস্ত পদার্থ সেই অমোঘ শক্তির ভিতরে রহিয়াছে, কিন্তু

মানবগণ বিষয়-বিষপানে বিশুদ্ধ স্বর্গীয় সুধা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করে না। অসার ঐশ্বর্য্যকে তৃপ্তির নিদান বুঝিয়া কৃতার্থ হইতেছে। চক্ষের নিমেষ-কালও চিন্তা করে না যে, এই অনিত্য ভোগ-সুখের আতিশয্য বশতঃ পাপের তীব্র দহনে দগ্ধ হইতে হইবে! জগতের বিচিত্র সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া স্থূলের তত্ত্বে মূলের তত্ত্ব অনুসরণ করিতে বীতশ্রদ্ধ; সুতরাং বিভীষিকাময় বিকার ভাবে সতত উন্মত্ত। যেমন পতঙ্গগণ অগ্নির উজ্জ্বল জ্যোতিঃ দর্শন করিয়া মোহ বশতঃ তাহার মধ্যে প্রাণ বিসর্জ্জন করে, তেমনই রাজসিক ও তামসিক ব্যাপারের অনুষ্ঠানে অশান্তির অসহ্য যাতনা ভোগ করিতেছে।"

প্রশ্ন। ঈশ্বর সর্ব্বগত, সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বাশ্রয়। জড় জগৎ তাঁহার আশ্রয় ব্যতীত মুহূর্ত্তকালও থাকিতে পারে না, এমন স্থলে তিনি যে নির্লিপ্ত, তাহার প্রমাণ কি?

উত্তর। "এই প্রশ্নের সিদ্ধান্ত সহজ নহে। ইহার মীমাংসা যুক্তি দ্বারা কতদূর সম্ভব, বলা যায় না, তবে উত্তরে বলিবার কথা এই যে, পার্থিব পদার্থ সমূহ বিশ্ব-নিয়ন্তার ইচ্ছা সাপেক্ষ হইলেও স্থূল-তত্ত্ব অনন্ত সত্তায় থাকিয়া পৃথক্। কেননা, নিরাকার অনন্ত শক্তিকে কখনই পরিমিত পদার্থে আয়ত্ত করিতে পারে না। তবেই বলিতে পারা যায় যে, জড় জগতের বিচিত্রতা মধ্যেও ব্রহ্ম-শক্তি পদ্ম-পত্রে জলের ন্যায় অস্পর্শভাবে স্থিতি করিতেছে। ইহাতে তর্ক উপস্থিত হইতে পারে যে জড় জগৎ কি ব্রহ্মের উপাদান নহে। উহা কি বস্তুতঃই প্রপঞ্চময়—কেনই বা বলিব না? স্থূল বস্তুর পরমাণু নিত্যত্বে পরিণত হইয়াও বিকারভাবে কল্পনাব্যঞ্জক। ব্রহ্মের অসীম দৃষ্টির ভিতরে স্থিতি করিতেছে সত্ত্বেও জগত্তত্ত্ব সমূহ ভ্রম-মরীচিকাময় অনিত্য; ভৌতিক তত্ত্ব সমূহ ব্রহ্মশক্তিকে স্পর্শক্ষম নহে, যোগীগণের যোগ-শরীরই ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। কেননা, মহামিলন-যোগে যোগীর পার্থিব শরীরের

সহিত কিছুই সম্বন্ধ থাকে না। মোহ-তিমিরাচ্ছন্ন মানব মাত্রেই স্থূল জগতের সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া অনন্ত প্রসার মহাবিজ্ঞান-সিন্ধুর অতল তলে প্রবেশ করে না এবং আত্ম-তত্ত্ব জ্ঞান হারাইয়া ঈশ্বরের নির্লিপ্তভাবে বিবিধ সন্দেহ উপস্থিত করিতে থাকে, বুঝিতেছে না যে, পরিমিত পদার্থ কিছুতেই অনন্তকে আয়ত্ত করিতে পারে না।

মোহ বশতঃ জড়-বিজ্ঞানে ব্রহ্মকে প্রচ্ছন্ন রাখিয়া তাঁহার দর্শনের নিমিত্ত যে ব্যাকুলতা তাহা বৃথা। নিরাকার নিত্য চৈতন্য অসংখ্য অসংখ্য প্রাণীর হৃদয়াকাশে একইভাবে স্থিতি করিতেছেন, ইহা এক-বারও কেহ বিশ্বাস-চক্ষে দর্শন করিতে ইচ্ছা করেন না; বাহ্য বস্তু লইয়া ব্রহ্মের নানাপ্রকার মূর্ত্তি আরোপ করিয়া সুখী হন, একি ভ্রমের কথা নহে? প্রত্যেক প্রাণী মধ্যে চৈতন্য শক্তির ভাব বিকাশ পাইতেছে, ইহা প্রত্যক্ষ সত্ত্বেও তাহা বৃথা ভাবিয়া অচেতন জড় বস্তুতে ঈশ্বর-দর্শন বাসনা যে, উহা ভ্রান্তির আবরণ, উহা কেহই মনে করেন না।

বেদান্ত-দর্শনের গভীর প্রদেশে প্রবিষ্ট হইলে জড় তত্ত্বের সহিত ঈশ্বরের নির্লিপ্তভাব প্রত্যক্ষ করা যায়। বস্তুতঃই ঈশ্বরের পূর্ণ শক্তির তত্ত্ব অব্যক্ত অচিন্ত্য অনন্ত; সুতরাং কল্পনার ছায়ায় সসীম ভাবে তাঁহার প্রকাশ বুঝিতে পারা যায় না। তজ্জন্যই যোগীগণ জড়-বিজ্ঞান পরিত্যাগ করিয়া মহাবিজ্ঞানের আলোতে ব্রহ্ম-দর্শনে কৃতার্থ হয়েন। তবেই বুঝিতে পারা যায় যে, স্থূলতত্ত্ব হইতে নির্ম্মুক্ত হইতে পারিলে নির্ব্বিকার নিষ্কলঙ্ক নিত্যতত্ত্বের অনুসরণে সক্ষম হইয়া ব্রহ্মানন্দ রসে নিমগ্ন হওয়া যায়। এই অবস্থাতেই যোগ, ভক্তি, বৈরাগ্য এবং অষ্টম ভাবের লক্ষণ সকল বিকাশ পায়, হৃদয়ে স্বর্গীয় তত্ত্বের অধিকার জন্মে, পাপ তাপের তীব্র যাতনা ঘুচিয়া যায়, দুষ্প্রবৃত্তির কুটিলভাব আর থাকে না। যোগী হৃদয়াকাশে মহামিলনে অনন্ত সুখ সম্ভোগ করেন। এক মাত্র আনন্দময় মহাকোষে চিন্ময় ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কিছু দেখিতে পান না।

চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, উপগ্রহ প্রভৃতির সসীম দৃষ্টি বিদূরিত হইয়া কেবল তাঁহাতেই অবস্থিতি করিতেছি, এইমাত্র অনুভব শক্তি থাকে। এমন কি, পার্থিব দর্শন-শ্রবণেন্দ্রিয় সজীব সত্ত্বেও শিথিলতায় পরিণত হয়; চক্ষু-কর্ণের ক্রিয়া অর্থাৎ দেখিতে শুনিতে পায় না। সম্মুখে অসংখ্য অসংখ্য জনসমাগমে ভীষণ কোলাহল হইলেও জীবিতাবস্থাতেই · যেন মৃত শরীরের ভাব! এটি কি নির্লিপ্ত ভাবের উৎকর্ষ প্রমাণ নহে। জড় জড়িত শরীর হইতে যোগীর স্থিতি কোথায়?—ঐ যে অসীম পর-ব্যোমব্যাপী ব্রহ্ম স্বরূপে।

এখানে একটু গভীরভাবে ভাবিয়া দেখা আবশ্যক যে, যখন অসংখ্য জগৎ সকল ব্রহ্ম-সিন্ধু মধ্যে বুদ্বুদের ন্যায় ভাসিতেছে, তখন পরিমিত বস্তুতে ঐশী তত্ত্বের তুলনা কি অসম্ভব নহে? আত্ম-জ্ঞানে সহজেই বুঝিতে পারা যায় যে, ব্রহ্ম চৈতন্য ও জীব-চৈতন্যের মহামিলনই স্থূলের অভাব! ব্রহ্ম যে স্থূলাতীত নিরাকার নিত্য, কোন পার্থিব পদার্থ স্পর্শ করিতে পারে না, অথচ তিনি সর্ব্বগত নির্লিপ্ত।"

সাকার ভাব কি?—"এই বিষয়ের আলোচনা কেন যে আসিয়া পড়িল, বোধ হয় ইহার ভিতরে মঙ্গলময় বিধাতার মঙ্গল ইচ্ছা অবশ্যই কিছু আছে বলিয়া মনে হয়। নিরাকার নিত্য স্বরূপে জগৎ সমূহ এক একটী উপলখণ্ডের ন্যায় স্থিতি করিতেছে, অগণ্য প্রাণীগণ নশ্বর শরীর লইয়া চলিতেছে ও ফিরিতেছে, কিন্তু মহাপ্রাণের অভাবে ঐ অবয়ব বিশিষ্ট শরীর ভাবও বৃথা ও জড়।"

প্রশ্ন। যে সকল সাকার উপাসকেরা মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া ঈশ্বরের উপাসনা করেন, সেই মূর্ত্তিতে ব্রহ্ম-স্ফূর্ত্তি জ্ঞান করিতে বাধা কি?

উত্তর। "যোগী যোগ রাজ্যে জানিতে পারেন, একমাত্র সত্যই ধর্ম্ম। ধর্ম্ম ধৃ-ধাতুতে সিদ্ধ; যাহাতে সমস্ত ধারণ শক্তি আছে, তাহাই

ধর্ম্ম, অর্থাৎ ধর্ম্মই ব্রহ্ম। তবেই "ব্রহ্মকৃপাহি কেবলম্" এই মহামন্ত্র ভিন্ন পরিত্রাণের আর অন্য উপায় নাই। পৃথিবীতে যত প্রকার ধর্ম্ম আছে, তাহার মধ্যে ইহাই শ্রেষ্ঠ। যোগ-ভ্রষ্ট মানব কর্ত্তৃক সকাম কর্ম্ম দ্বারা কল্পিত ধর্ম্ম সমূহ সৃষ্টি হইয়াছে, ঐ সকল সময় সাপেক্ষ ধর্ম্মের আশ্রয় লইতে গেলে সহজেই জানা যায় যে, উহাদ্বারা অমূল্য সময় নষ্ট ভিন্ন আর কিছুই নহে। একেশ্বরবাদ অভ্রান্ত ধর্ম্মের আলোকে ঐ সমূহ ক্ষণস্থায়ী ভাব নষ্ট করিয়া দেয়, তবে যে সম্প্রদায় বিশেষে কেহ কেহ আধ্যাত্মিকভাবে সাকার-মূর্ত্তি পূজা অর্থাৎ পরিমিত মূর্ত্তির আরাধনাটী স্থির রাখিবার জন্য যুক্তির তুঙ্গ তরঙ্গে ভাসিতেছেন, উটী একটুকু ভাবিবারই কথা! কেননা, একেশ্বরবাদ ধর্ম্মে যে ভাবেই কল্পনা প্রবেশ করুক না কেন, তাহা স্থান পাইবে না।

সংসারে ধর্ম্মের সমতা বিচ্ছিন্ন হওয়ার মূল কারণ এই যে, মানবগণ ইচ্ছা, রুচি ও প্রীতির পরিবর্ত্তনে দ্বেষ দম্ভাদির কঠোর শাসনে হীনবল হইতেছে। মানবীয় শক্তি সঙ্কীর্ণ, সুতরাং ঐ সঙ্কীর্ণ শক্তিকেই সকলে আশ্রয় করেন। অনবরত তর্ক-যুক্তির খরধারে পড়িয়া কল্পনার ভীষণ প্রভাবে আশুতৃপ্তি ভাবময়ী মূর্ত্তির আশ্রয় গ্রহণে চরিতার্থ হন এবং বিবিধ ভাবে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের পূজা অর্চ্চনা করিয়া আপনাকে ধন্য বোধ করেন। কি আশ্চর্য্য! স্বয়ং নির্ম্মিত মূর্ত্তিতে ব্রহ্ম-দর্শন! পুরাণাদি গ্রন্থের মূল তাৎপর্য্য না বুঝিয়া ঘোর অন্ধকারে ডুবিতেছেন, তথাপি তদ্দ্বারা প্রকৃত তত্ত্বকে প্রচ্ছন্ন রাখিতে কুণ্ঠিত নহেন।

ঈশ্বরের অনন্ত সত্তা মধ্যে ঐ সকল জড় মূর্ত্তিও স্থিতি করিতেছে সত্য, কিন্তু পরমাশ্রয় পরব্রহ্ম তাহাতে নির্লিপ্ত; এক সমুদ্র হইতে যেমন বিম্ব সমূহের উৎপত্তি দেখা যায়, আবার ঐ সকল বিম্ব ভাঙ্গিয়া গেলে অসীম সিন্ধু ভিন্ন আর কিছুই দেখা যায় না, তেমনই ঐ সকল মূর্ত্তি কেন, প্রাণীপূর্ণ জগৎসমূহও ঈশ্বরে প্রকাশ ও বিলুপ্ত হইয়া থাকে। অথচ

ব্রহ্ম নির্লিপ্ত। এ বিষয় আলোচনা স্থলে উক্ত হইয়াছে একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে জগতের যাবতীয় পদার্থ ব্রহ্ম-সিন্ধু মধ্যে মগ্ন রহিয়াছে বটে, ফলতঃ পরিমিত তত্ত্বে স্বতন্ত্র। তবে যে সকল বিচিত্র ভাব দেখা যায়, উহার অন্তঃপ্রবিষ্ট একই শক্তির কার্য্য হইলেও ক্ষণস্থায়ী ও জড়। এ স্থলে দেখা আবশ্যক যে, জড়তত্ত্বের অনিত্যতা নিবন্ধন পরিমিত ভাব প্রবল হইয়া বিশুদ্ধ প্রজ্ঞাকে ম্লান করিয়া থাকে, এজন্য মহাকাশ-ভেদী পূর্ণ পরমেশ্বরের দর্শন লাভ অসম্ভব।

ধূপ দীপ নৈবেদ্যাদি দ্বারা রাজসিক তামসিক পূজার বিধানে পরি-তৃপ্তির পূর্ণতার অভাব বুঝিয়াই যোগীগণ অরণ্যে এবং শ্মশানে গভীর ধ্যান-যোগে মগ্ন রহিতেন। তাঁহারা এমন কি বস্তু পাইয়াছিলেন যে, সুখৈশ্বর্য্যের চরম ভোগ গৃহবাসে জলাঞ্জলি দিয়া প্রচণ্ড বাত্যা, ভয়ঙ্কর শিলাবৃষ্টিতেও অধৈর্য্য হইতেন না। তবেই বলিতে পারা যায়, স্থূল তত্ত্বে সর্ব্বব্যাপিণী অসীম শক্তির বিকাশ সম্ভবপর নহে। কারণ, কোটী কোটী জড় জগৎ একত্রীভূত হইলেও সে পরিমিত পদার্থ! তদ্দ্বারা ব্রহ্ম-দর্শনের পবিত্র পথ পরিষ্কৃত হয় না। যাহা হউক, এস্থলে এ বিষয় অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই। সীমাবদ্ধভাবে যতই বিশ্বাসকে দৃঢ় করা যায়, ততই সে অন্ধ-বিশ্বাসে পরিণত হয়। যেমন স্ফটিকময় মন্দিরাভ্যন্তরে একটী প্রজ্জ্বলিত দীপ রাখিলে চতুষ্পার্শ্বে যে সকল দীপ-শিখা প্রকাশ পায়, ঐ সকল ছায়া-শিখা স্পর্শ করিলে কি সত্য সত্যই প্রকৃত দীপ-শিখা ধরা যায়? তেমনই ব্রহ্ম-স্পর্শ ভাবেও জড় বস্তুতে অস্পর্শ ভাব, এ বিষয় সন্দেহ নাই।

এস্থলে প্রাগুক্ত ঐ স্ফটিকময় গৃহস্থিত দীপ-শিখার ন্যায় ছায়া-রূপ পরিমিত তত্ত্বকে অবলম্বন করিয়াও আশু তৃপ্তি ব্যতীত আর কিছুই নহে, অচেতন বস্তুতে ব্রহ্ম ভাবনাও সমীচীন বলিয়া যেন মনে হয় না। সসীম বস্তুতে অখণ্ড চিন্ময় ব্রহ্ম-দর্শন করা উহা সময়পাতই বলিতে হয়

জ্যোতিশ্চক্ষুতে দেখিলে একমাত্র অদ্বিতীয় অনন্ত মহাচৈতন্য ব্যতীত আর কিছুই দর্শন হয় না।

অনেকে ভ্রান্তির অন্ধকারে পড়িয়া ব্রহ্ম-দর্শন ভাব বুঝিতে ইচ্ছা করেন না। অনিত্য বাসনাময় সকাম সাধনে, নিষ্কাম যোগ-পথে ভ্রান্তির কবাট দিয়া মোহ-কীলকে দ্বার রুদ্ধ করিতে থাকেন এবং পথ-ভ্রান্ত পথিকের ন্যায় ঘুরিয়া কাম্য ধর্ম্মে মর্ম্ম-গ্রন্থিকে দৃঢ় করিতে চেষ্টা করেন। ভাবিয়া দেখেন না যে, অসংখ্য অসংখ্য প্রাণীপূর্ণ ব্রহ্মাণ্ড সমস্তই ত একমাত্র ব্রহ্ম-সত্তাতে মগ্ন রহিয়াছে, তবে এখানে প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, একমাত্র ঐশী শক্তির ভিতরে যখন স্থূল অস্থূল সকলই রহিয়াছে, তখন কি পরিমিত তত্ত্বে ঈশ্বর প্রকাশ হইতে পারেন না? তাহার উত্তরে বেশ বলা যাইতে পারে যে, পরিমিত তত্ত্ব কিছুতেই অসীম ঐশীশক্তিকে গ্রহণ করিতে পারে না, সহজ জ্ঞানেই বুঝিতে পারা যায়, ক্ষুদ্র পল্বল কখনই অকূল সমুদ্রকে আকর্ষণ করিতে সমর্থ হয় না, ঐ ভীষণ ঊর্ম্মিময় সিন্ধুই পল্বলকে আপনার মধ্যে ডুবাইয়া লয়, বস্তুগত ভাবটিও সেইরূপ।

এখন স্পষ্টই বলিতে পারা যায়, ব্রহ্মকে কেহই আনিতে পারেন না, তিনি যে সর্ব্বব্যাপী—কোথাও এমন স্থান কি আছে যে, তাঁহাকে আনিয়া বসাইবেন? অখণ্ড অনাদি পুরুষকে কি কখন কল্পনা স্পর্শ করিতে পারে? তিনি যে পূর্ণ সত্য—নিষ্কলঙ্ক, নির্ম্মল ও পবিত্র। অন্তশ্চক্ষু না ফুটিলে তাঁহাকে দেখা যায় না।"

বিশ্বাস-সাধন-শান্তি—"সংসারে যে সকল অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হওয়া যায়, তাহার মূলে একটী ভিত্তি চাই, তাহা না হইলে কোন কার্য্য নির্ব্বাহ হইতে পারে না। লিখন সামগ্রী সম্মুখে কিছু উপস্থিত না থাকিলেও যেমন ঘরের কোন স্থানে একখণ্ড অঙ্গার দ্বারা লিখন কার্য্য সম্পন্ন হয়, তেমনই আধ্যাত্মিক সাধন ভজনেও ভিত্তি স্থির করা

আবশ্যক। এ সম্বন্ধে মনে হয়, একমাত্র বিশ্বাসই ধর্ম্মের ভিত্তি, ইহাতে সকল অনুষ্ঠান যে সম্পূর্ণ হয়, এ কথার কিছুমাত্র সংশয় নাই।"

প্রশ্ন। বিশ্বাসের মূলে সাধন-তত্ত্ব লাভ হয়, না সাধনের মূলে বিশ্বাস ও শান্তিকে লাভ করা যায়? এই তত্ত্ব ত্রয় মধ্যে অগ্রে কাহাকে গ্রহণ করা কর্ত্তব্য।

উত্তর। "বিশ্বাসই মূল—অন্তর্জগতে একমাত্র পরব্রহ্মের ধ্যান ধারণায় বাত বিকম্পিত বৃক্ষের ন্যায় মোহ মুগ্ধ চঞ্চল চিত্তকে একাগ্রতার দৃঢ় বন্ধনে বদ্ধ রাখিয়া গাঢ় অন্ধকারের ভিতরে স্থির করিতে হইবে। যতই বিশ্বাস ঘন হইয়া আসিবে, ততই ঘোর নীলিমাময় মহাকাশ স্বচ্ছ ও উজ্জ্বল হইতে থাকিবে; তখনই জানা গেল যে, বিশ্বাস ঘন হইয়াছে। ফলতঃ নিবিড় তিমিরাবৃত হৃদয়াকাশে যাঁহার বিশ্বাস প্রবল থাকে, তাঁহারই সাধনের ভিত্তি দৃঢ় হয়। তখন পৃথিবীর দৃষ্টি অন্তর্হিত হইয়া যায়, অন্তর্জ্যোতিঃ লক্ষ্য হইতে থাকে। সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বরের অনন্ত স্বরূপভাবে স্পৃহা জন্মে, নাস্তিকগণের প্রতি ভয় হয়। তর্কযুক্তির পরিচালন ভাবকে অগ্রাহ্য ভাবিয়া আসক্তির যন্ত্রণা হইতে পরিত্রাণ পায়। বিশ্বাসই উজ্জ্বল চক্ষু হইয়া ঈশ্বরের দর্শন পথ দেখায়।

বিশ্বাস দুই ভাগে বিভক্ত। একটী সরলতার মূলে সিদ্ধ বিশ্বাস, অপরটী তর্কের মূলে অন্ধ বিশ্বাস। সিদ্ধ বিশ্বাসের কথা উপরে উক্ত হইয়াছে, এক্ষণে অন্ধ বিশ্বাসের কথা সঙ্ক্ষেপে কিছু বলা আবশ্যক। মানুষ সহসা তর্ক যুক্তিকে বড় ভালবাসে উহাদ্বারা সংসারে সম্মানিত হইতে হয়, এজন্য প্রীতির একশেষ ভাবিয়া আপনাকে কৃতার্থ বোধ করে, সুতরাং সরল বিশ্বাসের প্রতি উদাসীন। "একটী ক্ষুদ্র শিলাখণ্ডে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিলেও ঈশ্বর লাভ হইতে পারে," ইহাকেই কি প্রকৃত বিশ্বাস বলা যায়। অগ্নিশিখাকে তুষার প্রবাহ বিশ্বাস করিলে কি সত্য সত্যই অনল শীতল গুণে অভিহিত হয়। যাহা হউক,

ঐ দ্বিবিধ বিশ্বাস মধ্যে কাহাকে দৃঢ়রূপে ধরা বিধেয়? যুক্তি দ্বারা যে বিশ্বাস স্থিরীকৃত হয় তাহা কল্পিত, কেননা, মানবীয় শক্তি সঙ্কীর্ণ; সরল বিশ্বাস দেবপ্রদত্ত, এজন্য তাহা সিদ্ধ। এই বিশুদ্ধ সিদ্ধ বিশ্বাসের দ্বারা সাধন ও শান্তি লব্ধ হয়; বিশ্বাস দৃঢ় হইলে ব্যাকুলতা আসিয়া দেখা দেয়, তখন সংসারের সমস্ত পদার্থ মৃৎপিণ্ড তুল্য বৃথা বোধ হয়। যে সকল বস্তু প্রাণের প্রীতি সঞ্চার করিত, সে সকল বস্তুতে আর কিছুমাত্র স্পৃহা থাকে না। স্ত্রী-পুত্র-প্রিয়জনের হাসি হাসি মধুর কথা আর ভাল লাগে না। হৃদয়ের ভিতরে কি যে একটী অপূর্ব্ব ভাবের আবির্ভাব হয়, তাহা বলিতে পারা যায় না; দাবানল দগ্ধ হরিণের ন্যায় ব্যস্ত হইয়া নানাস্থানে ছুটাছুটী করে, এইরূপ অবস্থায় ব্রহ্ম-দর্শনের জন্য অকৃত্রিম ব্যাকুলতা আইসে। তখনই ঐ সিদ্ধ বিশ্বাস, সাধনের প্রকৃত তত্ত্ব বুঝাইয়া দেয়।

এখানে সাধনের চারিটী তত্ত্বমাত্র সংক্ষেপে বলিতেছি। প্রথম তত্ত্ব, বিশ্বাসের সঙ্গে জগতের সাময়িক ব্যাপার সমূহ পৃথক্ রাখিয়া একমাত্র ঈশ্বরে স্থিতি করিতেছি মনে করা,—ইহা ভাবের সাধন। দ্বিতীয় তত্ত্ব, আপাত মধুর বিষয়াসক্তির প্রলোভনে প্রতারিত হইয়া জড়-জগতের মায়িক পদার্থে পুনর্ব্বার আকৃষ্ট না হওয়া—ইহা ইচ্ছার সাধন। তৃতীয় তত্ত্ব, মায়ার দুর্ভেদ্য জাল ভেদ করিবার জন্য ব্রহ্ম-জ্ঞান লাভ—ইহা জ্ঞানের সাধন। চতুর্থ তত্ত্ব; ধ্যান যোগ মধ্যে প্রবেশ করিলে নিষ্কাম প্রার্থনা—ইহা ভক্তির সাধন। এই চতুর্ব্বিধ সাধন তত্ত্বকে প্রাণে ধারণ করিতে পারিলে নির্ভর ও আত্মসমর্পণের শক্তি জন্মে, কিন্তু ইহার ভিতরেও একটী কথা আছে। সাধনা যদি নিষ্কামভাবে না হয়। তবেই ভয়ানক বিভ্রাট! সাধনে উপকার অপকার উভয়ই সংঘটন করে, সরল বিশ্বাসের বলে সাধনা করিলে উপকার—অন্ধ বিশ্বাসের বলে সাধনা করিলে সম্পূর্ণ অপকার। এস্থলে সাধককে বড়ই সতর্ক থাকিতে হয়। কখন যে

কে তর্ক-জাল বিস্তার করিয়া সম্মুখে দাঁড়াইবে, তজ্জন্য সতত সাবধান থাকিতে হইবে। কত শত যোগী, সাধক, ভক্ত টলিয়া পড়িয়াছেন। এখনও ঐ জাল বিস্তার করিয়া অনেকে সরল বিশ্বাসী ভক্তকে ভয় প্রদর্শন করিতেছেন এবং নিরাকার ব্রহ্ম-সাধনের বিরুদ্ধে নানা কথা বলিয়া থাকেন। তাই বলিতেছি, সরল বিশ্বাসকে অনুসরণ করিয়া সাধন পথে চলিয়া যান—কোনই বিপদ ঘটিবে না, সাধন-তত্ত্ব হৃদয়ে প্রকাশ পাইতে থাকিবে, সাধনের অভ্রান্ত তত্ত্ব শিক্ষা হইবে, অসার বাহ্য ভাব চলিয়া যাইবে,—একমাত্র ব্রহ্মকেই গুরু ও পরিত্রাতা জানিবার শক্তি জন্মিবে, অন্ধ বিশ্বাস আর থাকিবে না।

ক্রমে ক্রমে বিশুদ্ধ সত্য-জ্যোতিঃ বিকাশ হইতে থাকিবে এবং প্রেমের উৎস উথলিয়া উঠিবে, বিবেকের মৃদু মধুর কথাগুলি শুনিয়া চৈতন্যোদয় হইবে, তখন কে কথাগুলি বলিল, তাহার জন্য প্রাণ আকুল হইয়া উঠিবে; হৃদয়ভেদী ব্যাকুলতা আর দেখা না দিয়া থাকিতে পারিবে না। তখন "কে তুমি কথা বলিয়া প্রাণকে মুগ্ধ করিলে, শীঘ্র আমায় দর্শন দিয়া রক্ষা কর।" এই প্রাণের প্রার্থনায় স্বর্গের দ্বার খুলিয়া যাইবে। শান্তি স্বরূপ পিতা "ভয় নাই" বলিয়া সান্ত্বনা বিধান করিবেন (এই ত আমি আছি ভয় কি! ভয় কি!) আঃ—যোগী যেন মাতৃ-হারা ছেলের ন্যায় ভাবিতেছিলেন, মাকে পাইয়া ভয় ভাবনা হইতে মুক্ত হইলেন। আনন্দের আর সীমা নাই—স্বর্গের অনুপম জ্যোতিঃ দেখা দিল।, আনন্দ বাড়িল—অজস্র অমিয়া ধারায় দগ্ধ হৃদয় শীতল হইল, হৃদয়-গ্রন্থ পাঠ করিয়া প্রাণ খুলিয়া গেল।

শান্তির শীতল বাতাস বহিতে আরম্ভ করিল। মুহূর্ত্ত মধ্যে বিষাদ কালিমাময় হৃদয় অব্যক্ত আলোকে আলোকময়! আর কি কোনরূপ বিঘ্ন বিপদ থাকিতে পারে? অনন্ত ব্রহ্ম জ্যোতিতে এমন কি, ধ্যানের সহায় সেই গভীর অন্ধকারও চলিয়া গেল। দেবভাবের মহাস্রোত অবিশ্রান্ত

বহিতে লাগিল। সেখানে দুঃখ সন্তাপের লেশমাত্রও নাই। ঐ যে আশ্বাসবাণী হইতেছে—"অভেদ ধর্ম্ম গ্রহণ কর, তবেই ব্রহ্মসাগরে ভাসিবে, সকলকে মজাও ও নিজে মজ, শান্তির স্নিগ্ধ তরঙ্গে ভাসিয়া যাও।" এই ত সিদ্ধ বিশ্বাসের মূলে সাধন তত্ত্ব ও শান্তির ব্যাপার, ইহা অখণ্ড যোগের মধ্যে বিকাশ পায়। সেই বিভু প্রদত্ত "মধুরবাণী" কত মধুর! কত আনন্দপ্রদ! ইহা যোগী ভিন্ন কে বুঝিবে? স্বর্গের ব্যাপারই বিচিত্র! শান্তি সিন্ধুর অতল তলে ডুবিলে ফুলে শান্তি, ফলে শান্তি, জলে শান্তি, স্থলে শান্তি, প্রাণে শান্তি, মনে শান্তি, সকলই শান্তিময়।"

সময় ও ঐশ্বর্য্য—"সংসারে সময় অবলম্বনে সকলে সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন করেন। দিবাভাগে প্রত্যেক প্রাণী জঠরচিন্তায় ব্যতিব্যস্ত! রজনীতে সকলে গভীর নিদ্রায় অভিভূত। পশু পক্ষীরাও ষড়বিধ জ্ঞানের পরিচালনায় আহার অন্বেষণে ও বাসস্থান নির্ম্মাণে নিরত। ইহারাও অন্তবিধ ব্যাপারে সময়কে ব্যবধানে রাখিতে পারে না এবং বৃথা কার্য্যেও সময়কে হারায় না। মানবগণ অসার গল্পে ও তাস পাশায় উন্মত্ত হইয়া সময়ের কর্ত্তব্য পালনে উদাসীন, ঐশ্বর্য্যের বিশুদ্ধ ব্যবহার করিতে অক্ষম। কেবল, স্বার্থভাবের আতিশয্য বশতঃ পরস্পরের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন দ্বারা অহঙ্কারে স্ফীত হয়।"

প্রশ্ন। সময় ও ঐশ্বর্য্য মধ্যে কাহাকে শ্রেষ্ঠ ভাবিয়া গ্রহণ করা উচিত। সময় প্রিয় কি ঐশ্বর্য্য প্রিয়? দেখা যাইতেছে উভয়ই উভয়কে অবলম্বন করিতেছে, ঈদৃশাবস্থায় সময়কে ঐশ্বর্য্যের ভিতরে দেখা আবশ্যক না সময়ের ভিতরে ঐশ্বর্য্যকে দেখা আবশ্যক।

উত্তর। "সংসার সময় ঐশ্বর্য্য উভয়েরই অধিকারে অবস্থিতি করিতেছে। মনুষ্যমাত্রই প্রবৃত্তির অনুবর্ত্তী হইয়া সময়কে বিবিধ ভাবে গ্রহণ করে। অর্থাকাঙ্ক্ষিরা ঐশ্বর্য্যকে শ্রেষ্ঠ জানিয়া প্রাণের ভিতরে রাখিতে চায়, বিভব ভোগে সময়কে মুহূর্ত্ত কালও সাধু কার্য্যে গ্রহণ করে

না, অবিশ্রান্ত অসার আশার অনিবার্য্য স্রোতে ভাসিতে থাকে। পাপ প্রবৃত্তির বশীভূত থাকিয়া পৃথিবীতে ক্ষণস্থায়ী কীর্ত্তি সকল প্রচার দ্বারা সম্মানিত হইতে ইচ্ছা করে। আড়ম্বরের সহিত স্ফূর্ত্তি দেখাইতেও কুণ্ঠিত হয় না। এই কি সময় ও ঐশ্বর্য্যের প্রকৃত কার্য্য? অনিত্য ঐশ্বর্য্যকেই কি হৃদয়ের একমাত্র সার ভাবিয়া পরিতৃপ্ত হইতে হইবে? মেদ-পুরীষাদি পূর্ণ শরীরের সৌন্দর্য্য সাধনের নিমিত্তই কি সময়ের সমাদর করা উচিত?

ভাবিয়া দেখিলে, প্রতিমুহূর্ত্তের কর্ত্তব্য কার্য্যের ব্যত্যয় ঘটিলে ঐরূপ অস্থায়ী ধন সঞ্চয়ে জীবন শেষ করিলেও কিছু উপকার হয় না। অগ্নি, জল, অস্ত্র ব্যবহার করিতে গেলে, যেমন অসাবধানতা নিবন্ধন নিজেই যন্ত্রণা পাইতে হয়, তেমনই সময়ের ভিতরে ঐশ্বর্য্যকে মহদ্ভাবে চালাইতে না পারিলে, ঐ সময় কর্ত্তৃকই আবার অনিষ্ট সংঘটিত হয়। একটী দুর্গম অরণ্য অতিক্রম করিতে হইলে দিবাভাগের দীপ্তিময় সময়কে আশ্রয় করা বিধেয়। তাহাতে ঔদাস্য করিলে অমা তামসীর ন্যায় ঘোর অন্ধকারে কি বিপদ ঘটিতে পারে না? সময়েরও দুই প্রকার ব্যবহার রহিয়াছে। পবিত্রতার মধ্যে সময়ের সামঞ্জস্য করিতে পারিলে, কোনই অনিষ্ট সম্ভবে না। আবার অসদাচারে সময়ের সম্বন্ধ রাখিতে গেলে, ভয়ানক বিপদের আশঙ্কা! এখন দেখা আবশ্যক যে সময় যখন শুভাশুভ উভয়ের মধ্যেই অবস্থান করিতেছে, তখন কোনটী অবলম্বন করা কর্ত্তব্য? সকলেই বলিবেন শুভ সময়কেই গ্রহণ করা উচিত। তবে আমরা ক্রীড়া রস তরঙ্গে ভাসিয়া অমূল্য সময় নষ্ট করি কেন? ধনৈশ্বর্য্যই যদি জীবনের সার বস্তু হয়, তবে ঐ অর্থ কি বাই, থেম্‌টায় বাজী পোড়ানে ব্যয় করা বিধেয় না, দীন দুঃখী আতুর অন্ধদিগকে একমুষ্টি অন্ন ও একখানি বস্ত্র দিয়া তাহাদের জীবনরক্ষণে ও লজ্জা নিবারণে ব্যয় করা উচিত নহে কি? তবেই বলিতে পারা যায়, ঐ

রূপ অর্থ সংগ্রহে যে সময় ব্যবহৃত হয়, তাহা বৃথা! যে সকল ব্যক্তি অর্থের ও সময়ের সৎব্যবহারের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া বৃথা কার্য্যের প্রতি অনুরক্ত থাকে, তাহারা একান্তই পৃথিবীর ভার স্বরূপ।

এস্থলে অনেকে বলিতে পারেন, তবে কি অর্থ সঞ্চয়ের জন্য সময় ব্যয় করিবার প্রয়োজন নাই? এ কথা কে বলে? সময় যে সকলেরই আদরের বস্তু। অদূরদর্শীরাই অনিত্য সুখৈশ্বর্য্যের নিমিত্ত লালায়িত হয়। সাধুভাবে সময় ও সম্পদের সদ্ব্যবহার না করিলে প্রকৃত সুখের অধিকারী হইতে পারে না। আশ্রমবাসীরা একমাত্র স্ত্রী পুত্রাদির সুখের নিমিত্ত যে অর্থ সঞ্চিত রাখে, তাহা ঈশ্বরের অনুমোদিত নহে। ভগবান প্রত্যেক মানবকে সাধু সঙ্কল্পে সিদ্ধ করিবার অভিপ্রায়ে পার্থিব ঐশ্বর্য্যের বিধান করিয়াছেন। কিন্তু ইহার গূঢ় মর্ম্ম না বুঝিয়া স্বার্থ-পরিচালিত হইয়া কর্ত্তব্য পালনে বিরত হইলে, আমিত্বের আতিশয্য বশতঃ ধন মত্ততায় আপনাকে উচ্চ ও অন্যকে তুচ্ছ মনে করিলে, নিশ্চয়ই অপরাধী হইতে হয়। স্বার্থ কৌশলে যে অর্থ সঞ্চিত হয়, তাহা বিনাশের কারণ ব্যতীত কিছুই নহে। এ কথার প্রতি লক্ষ্য থাকিলে, কখনই বিপদের সম্ভাবনা থাকে না। সত্যানুষ্ঠান দ্বারা যে উপার্জ্জন হইয়া থাকে, তাহাই যথার্থ অর্থ সঞ্চয়, উহাতেই পৃথিবীর প্রীতির কার্য্য হয়। বিশুদ্ধ জ্ঞানের অনুসরণে যে সমূহ অর্থ সংগৃহীত হয়, তাহাই প্রকৃত ঐশ্বর্য্য! স্বার্থ জড়িত বিপুল বৈভব হইলেও তাহা কিছুই নয়, কেবল পবিত্র সময়কে কলুষিত করা ব্যতীত নহে।

সংসারে সত্য সূচনা বলেই নিত্য সম্পত্তির অধিকারী হওয়া যায়। কেননা, সত্যের অনুষ্ঠানই পারমার্থিক বিষয়ের সহানুভূতি সুতরাং তৎকর্ত্তৃক বিশুদ্ধ ভাব অন্তরে বাহিরে সমভাবে বিকাশ পাইতে থাকে। আধ্যাত্মিক সুখৈশ্বর্য্যের প্রতি নিষ্কলঙ্ক অকৃত্রিম ব্যাকুলতা সহসা প্রাণে আসিয়া পড়ে। পার্থিব ঐশ্বর্য্যও পবিত্রতার ভিতরে মিশিয়া যায়।

অগ্নি স্পর্শে চন্দন কাষ্ঠ যেমন তাহার স্নিগ্ধ সৌগন্ধে প্রাণকে পরিতৃপ্ত করে, তেমনই স্বার্থ কলুষিত ঐশ্বর্য্যও সদনুষ্ঠান দ্বারা পবিত্রতায় পরিণত হয়।

অলস প্রকৃতির ব্যক্তিরাই সাধু কার্য্যের ভিতরে প্রবেশ করিতে চায় না এবং সত্যের বিশুদ্ধভাবে সময় ও ঐশ্বর্য্যকে ব্যবহার করে না। সংসারের যাবতীয় ব্যাপারে যে ষড়ৈশ্বর্য্যময় ভগবানের অব্যর্থ শক্তি নিহিত আছে, তাহা বুঝিতে না পারিয়া দুষ্প্রবৃত্তির বশে নরক যন্ত্রণা ভোগ করিবে, তথাপি সৎ প্রবৃত্তির আশ্রয়ে মহৎকার্য্য সাধনে উদাসীন। হায়! ঐশ্বর্য্য-পিপাসা কি ভয়ঙ্কর! অনেকেই অসার সম্পদ যে ক্ষণস্থায়ী ইহা দেখিয়াও অজ্ঞানতার ঘোর অন্ধকারে প্রবেশ করিতেছে, কিছুতেই সত্যের উজ্জ্বল জ্যোতিঃ স্পর্শ করিতে চাহিতেছে না।

আর অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই। মনুষ্যমাত্রই কর্ম্মক্ষেত্রে অবস্থিতি করিতেছে সত্য, কিন্তু স্বকাম কর্ম্ম পরিত্যাগ না করিলে নিষ্কাম কর্ম্ম প্রকাশ পায় না এবং সঙ্কল্প সিদ্ধও হয় না। বাস্তবিকই নিষ্কাম তত্ত্ব চিন্তা সম্বন্ধে অনেকেরই বীতশ্রদ্ধ ভাব! নিশ্চয় বলিতে পারা যায়, অনাসক্ত বৈরাগ্যের আশ্রয়ে থাকিলে ভয়ের কারণ নাই, ইহা সকলেরই জানিয়া রাখা উচিত; কারণ মহত্তত্ত্বের মধ্যে স্পষ্টই জানা যায়, সত্য সাধনই মানবের কর্ত্তব্য পালন। ইহসংসারে সত্যই সার বস্তু! বহির্জগতে ও অন্তর্জগতে সমভাবে সময় ঐশ্বর্য্যকে ঈশ্বরের প্রীতির কার্য্যে রাখাই শ্রেয়ঃ। তাহা হইলে বিশুদ্ধ সময় ও ঐশ্বর্য্যের পবিত্র তত্ত্ব লাভ হইবে, ভাবিয়া দেখিলে সময়ই সুখের নিদান। আমরা যেন পার্থিব ঐশ্বর্য্যে মুগ্ধ হইয়া অবিনাশী স্বর্গীয় পরমৈশ্বর্য্যকে ভুলিয়া না যাই। তাহা হইলে নিশ্চয়ই বিশুদ্ধ সময়ের সদ্ব্যবহার করিতে সক্ষম হইব সন্দেহ নাই।"

**সুরা সেবন**—"পৃথিবীতে অধিকাংশ লোকেই কোন না কোন

মাদক সেবনে অনুরক্ত। আবার সাধকমণ্ডলীর মধ্যেও ধর্ম্মের ভানে পার্থিব সুরা স্রোত প্রবলবেগে চলিতে দেখা যায়, কি আশ্চর্য্য! সংসারে বীভৎস রসের কার্য্য সকলও ধর্ম্ম বলিয়া স্থান পাইতেছে। মহামনস্বীরাও সুরা সেবনে অসার হইয়া রুদ্রমূর্ত্তিতে স্ফূর্ত্তি ও আনন্দ প্রকাশ করেন। নিরক্ষর অনভিজ্ঞের ত কোন কথাই নাই। জ্ঞানী, ধ্যানী, সাধক ইহাঁরাও ত সেই মাদকের অনিবার্য্য তরঙ্গে পড়িয়া জগতের অনিষ্ট উৎপাদন করিতে ক্ষান্ত নহেন! অনেক স্থানে ভয়ানক লোমহর্ষণ ব্যাপারের কথাও শুনা যায়, ব্যাভিচারের ত কথাই নাই। ভাবিয়া দেখিলে, সুরাপান ধর্ম্মও জগতে একটা ভয়ঙ্কর ব্যাপার।"

প্রশ্ন। এক ঐশী শক্তির ভিতরে জড়-তত্ব সমূহ স্থিতি করিতেছে। সুরাও ভৌতিক তত্ব দ্বারা উৎপন্ন! অন্যান্য মাদক হইতে সুরা এত শোচনীয় কেন? সত্য স্বরূপ পরমেশ্বর প্রত্যেক শরীরাধারে অবস্থিতি করিতেছেন, এমত স্থলে মানব সকল কি জন্য মাদকতা শক্তিতে যন্ত্রণা ভোগ করে?

উত্তর। "ঐশী শক্তি ভিন্ন কোন পদার্থই থাকিতে পারে না। পার্থিব বস্তু মধ্যেও স্বর্গীয় প্রেমের বিকাশ পায়, কিন্তু তাহার মত্ততা জড়ীয় পদার্থে কলুষিত হইয়া বিকৃত ভাব অবলম্বন করে। সুতরাং পার্থিব পদার্থের মত্ততা ঘোর বিপদজনক ব্যাপার সন্দেহ নাই। যেমন নির্ম্মল জলে একবিন্দু মসি প্রক্ষেপ করিলে, সেই স্বচ্ছ সলিল সমূহ নীল বর্ণে পরিণত হয়, তেমনই স্বর্গীয় প্রেমের পবিত্র মত্ততাও জড়ীয় বস্তুর সংস্পর্শে দূষিত হইয়া যায়। বলিতে কি, জড় তত্বের অধিকারে শরীরস্থ শোণিত প্রবাহ ও ধমনীর ক্রিয়া রোধ করে। ইন্দ্রিয়াদির বিপর্য্যয় জনিত বুদ্ধি যন্ত্রের কার্য্য প্রকৃতভাবে চলে না, চঞ্চলতা আসিয়া চিত্তকে উন্মত্ত করিয়া তুলে এবং স্বাভাবিক জ্ঞানকে স্থির রাখিতে দেয় না। তজ্জন্য হিতাহিত ধর্ম্মাধর্ম্মের বিবেচনা শক্তি কিছুই থাকে না, কেবল

বিকারভাবে অজ্ঞানতায় ব্যাপার সকল প্রবল হয়। যকৃৎ পাণ্ডু রোগ প্রভৃতির ভয়ঙ্কর যাতনায় মৃত্যুমুখে পতিত হইতেও দেখা যায়, তথাপি প্রকৃত জ্ঞানের দিকে তাকাইয়া সাংঘাতিক ব্যাপারে নিবৃত্ত হয় না।

ঈদৃশ বিষম অনিষ্টকর বিষয়ে বিবেচনা করা কর্ত্তব্য যে, জড়-তত্ত্বের বিকার ভাবেই বিশুদ্ধ প্রজ্ঞাকে মলিন করিতেছে, তাহার উত্তেজনায় নিষ্কলঙ্ক পবিত্র ভাবের ভিতরে প্রবেশ করিতে সমর্থ হয় না। আসক্তির শক্তি ক্রমেই প্রবলা হইয়া অশেষ প্রকার যন্ত্রণা দেয়। আহা! বিধাতার কি বিচিত্র বিধি! একই পৃথিবীর পরমাণু দ্বারা বিষবৃক্ষ এবং ইক্ষুর উৎপত্তি! অথচ উভয়ের শক্তির কি তারতম্য! একটীর রসে প্রাণ যায়, অপরটীর রসে রসনা তৃপ্তি লাভ করে। এটী কি বিশ্বপতির অচিন্ত্য কৌশল নহে? বস্তুর সংমিশ্রণের মত্ততা যে বিপদের কারণ, এ বিষয়ে সংশয় কি? উপরি উক্ত মাদক তত্ত্ব দুই ভাগে বিভক্ত, পার্থিব ও স্বর্গীয়। প্রথমতঃ পার্থিব মাদক তত্ত্বের কথা কিছু বলিতেছি, তীব্র মত্ততাপ্রদ উদ্ভিজ্জাদির রসপানে সহসা অজ্ঞান হইতে হয়, কেননা মনুষ্য অসার মাদকের উত্তেজনায় জ্ঞানের অধিকারী হইতে পারে না, জড় বস্তুতে আকৃষ্ট হইয়া সতত আচ্ছন্ন থাকে, হিতাহিত চিন্তা বিলুপ্ত হইয়া যায়, চেতনা শক্তি থাকা সত্ত্বেও অচেতন জড়বৎ অবস্থিতি করে। পরিবার মধ্যে হেয় এবং বংশের কণ্টক স্বরূপ হয়। সকলের নিকট পান দোষে তিরস্কৃত ও লাঞ্ছিত হইতে থাকে, কুস্থানে পড়িয়া কঠোর দুঃখ ভোগ করে। এখানে প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, যদি ঈশ্বরের পূর্ণ প্রেম হইতেই মত্ততার উৎপত্তি হয়, তবে মানুষ কি জন্য অধীর হইয়া ঐ সকল দুষ্কর্ম্মের প্রতি অনুরাগ প্রদর্শন করে। ইহার ভাব এই যে, মত্ততার শক্তি নিত্যানিত্য উভয় ভাবে প্রকাশ পাইলেও বিকারময় পার্থিব পদার্থে বিকৃত। আনন্দের উচ্ছ্বাস কিছু থাকিলেও তাহা ক্ষণস্থায়ী; কারণ, পরিমিত বস্তু মধ্যে পূর্ণ বিমলানন্দের নিত্য স্থিতি

অসম্ভব। বিকার বিকৃত মত্ততার আনন্দ একই স্বভাব সত্ত্বেও সংস্পর্শ জন্য মহাজ্ঞানের জ্যোতিঃ প্রকাশ করিতে পারে না। সুতরাং সুরাসেবী বিবেকান্ধ ব্যক্তির মত্ততায় যে সমূহ ব্যাপার উপস্থিত হইয়া থাকে, তাহা বিপদ ব্যতীত আর কি হইতে পারে? যোগিগণ কখনই স্বর্গীয় সুরা সেবনে মূর্চ্ছিত বা অজ্ঞান হন না, তাঁহাদের শরীরটী ব্রহ্মযোগে সর্প শল্ক-বৎ পৃথিবীতে অবস্থিতি করে বটে, কিন্তু বিবেক প্রসন্ন থাকাতে তাঁহারা ক্ষণকালও নিত্য প্রেমের মত্ততা হইতে বঞ্চিত থাকেন না। এখন দেখা যাউক স্বর্গীয় মত্ততা কি? এস্থলে পৌরাণিক তত্ত্বের গূঢ় বিষয়ের একটুকু আলোচনা আসিয়া পড়িল। পুরাণে শুনা যায়, দেব-দানব কর্ত্তৃক বাসুকী নাগ বেষ্টিত মন্দার পর্ব্বত দ্বারা সমুদ্র মন্থন হইয়াছিল। সেই অতল উদধি গর্ভে তাঁহারা সুরা প্রভৃতি লাভ করেন, বস্তুতঃ উহা কল্পনাপ্রসূত বলিয়া মনে হয়। যোগীর যোগ দর্শন ভাবটী বাহ্যভাবে ঐরূপ বর্ণিত হইয়াছে। সিদ্ধ যোগী মহাযোগে দেখিলেন, নিত্য সুরা-সেবী জীবাত্মা দেবতা ও অনিত্য মদ্যপায়ী অন্ধ-বিশ্বাস অসুর এই দেব-দানব দ্বারা বৈরাগ্য-ফণিরাজ জড়িত সিদ্ধ-বিশ্বাস-পর্ব্বতে ব্রহ্ম-সিন্ধু মথিত হয়। সেই অনন্ত প্রসার বারিধি হইতে প্রীতি-লক্ষ্মী, বিবেক-চন্দ্র, যোগ-ধন্বন্তরি এবং প্রেম-সুরা লাভ করিলে, ঐ প্রেমামৃতের অধিকারী দেব ভাবাপন্ন জীবাত্মা ভিন্ন আর কে হইবে? ব্রহ্ম-সিন্ধুর বিশুদ্ধ সুধাপানে কেনইবা সে কৃতার্থ হইবে না। কুপ্রবৃত্তিপরায়ণ অন্ধ-বিশ্বাস দৈত্য স্বর্গীয় সুধাপানে বঞ্চিত হওয়াতে মদগর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়া পুনর্ব্বার সিন্ধু-মন্থনে প্রবৃত্ত হয়। সে বার ঘোর অশান্তির তীব্র বিষ উঠিয়া তাহাদিগকে বড় বিপদগ্রস্ত করিল। অন্ধ-বিশ্বাস দানব কর্ত্তৃক এই ঘোরতর সঙ্কট উপস্থিত দেখিয়া "শিব-স্বরূপ" ব্রহ্মই আবার ঐ জ্বলন্ত কালকূট দহন যাতনা সংযত করিলেন। দেব-প্রকৃতিসম্পন্ন জীবাত্মা প্রেম-সুরা পান করিয়া কৃতার্থ হইলেন, সত্যভ্রষ্ট অন্ধ-বিশ্বাস অসুর অহঙ্কারজনিত বিকার দোষে

ব্রহ্মোদধি-মন্থনেও স্বর্গীয় সুধায় বঞ্চিত হয়; সেইরূপ মোহ-মুগ্ধ মানব সকল দুষ্প্রবৃত্তির বশে সংসারের সাংঘাতিক বিষের যাতনা ভোগ করে। জীবন্মুক্ত যোগিগণই স্বর্গীয় প্রেম-সুরা সেবনে অমরত্ব লাভ করেন, তাঁহাদিগের নিকট পার্থিব পাপ-সুরা পদদলিত হইয়া ঘৃণিতভাবে দূরে পরিত্যক্ত হয়, উহা কেবল রিপু চরিতার্থিগণের নরকময় হৃদয়েই স্থান পায়।

দেবপ্রদত্ত মত্ততার মাহাত্ম্য মহাপুরুষেরাই বুঝিতে পারেন। চৈতন্যের মত্ততাতে প্রেম-ভক্তি, শাক্যসিংহের মত্ততাতে নির্ব্বাণ, যীশুর মত্ততাতে বিশ্বাস, মহম্মদের মত্ততাতে একপ্রাণতা ও সত্যপ্রচার। এইরূপ সিদ্ধ পুরুষগণের বিশুদ্ধ সুরাপানে যে সকল মত্ততা বিকাশ পাইয়াছে, তাহাতে কি ঈশ্বরের প্রতি জ্বলন্ত প্রীতি-ভক্তির প্রমাণ হয় না? নিশ্চেষ্ট ব্যক্তিরাই অনিত্য সুরা-সেবী হইয়া ঘোর নরকে ভাসিতে থাকে, স্বর্গীয় সুরা সেবন করিতে চাহে না। একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে বেশ বুঝা যায়, প্রেম-সুরা বিপদের কারণ নহে! ইহাতে পবিত্র মত্ততা ভিন্ন আর কিছু নাই। অতএব জগতের নর-নারী সকলেরই ঐ স্বর্গীয় সুরা পানে প্রীতি সম্ভোগ করা প্রার্থনীয়।

ধন-গর্ব্বিত মানব মাত্রেই অসার লালসায় চিরশান্তি হইতে বঞ্চিত হয়; যেমন পুরীষরসপায়ী ক্রিমি সকলকে অমৃতকুণ্ডে রাখিলেও তাহারা অতৃপ্তি বোধ করে, তেমনই অনিত্য সুরা-সেবীরাও প্রেম-সুরার বিশুদ্ধ মত্ততাকে ভালবাসেন না, এটী বড়ই দুঃখের কথা! তাই বলিতেছিলাম, সকলেরই কর্ত্তব্য যে ভগবৎ প্রেরিত সেই পবিত্র সুরা সেবনে সংসার বন্ধন হইতে মুক্ত হন।"

**সজন ও নির্জ্জন সাধনা**—"সজনে ও নির্জ্জনে উপাসনা ও প্রার্থনাদি যে করা হয়, তাহাতে যে পর্য্যন্ত ঈশ্বর চিন্তায় মগ্ন থাকা যায়, সেই পর্য্যন্ত ভগবদ্ সহবাসে সকলে কৃতার্থ হন, কিন্তু দুঃখের বিষয় যে,

অনেকে উপাসনার পর অল্প সময়েই অনন্ত পুরুষের সহবাস হইতে বঞ্চিত হইয়া অসার আলোচনায় তত্ত্ব বস্তু হারাইয়া ফেলেন এবং মায়াময়ী পৃথিবীর প্রলোভনে মুগ্ধ হইয়া পড়েন, আর সেই ভাবটী থাকে না। ইহাতে যে আসক্তির প্ররোচনায় ঘোর অন্ধকারে নিক্ষিপ্ত হইতেছি, আমরা কেহই একবার তাহা ভাবি না; গভীর স্বরে বলিয়া থাকি, একমাত্র ঈশ্বরই পরিত্রাতা,তিনি ভিন্ন আর কেহই নাই, "আমার মধ্যেই ঈশ্বর" ইত্যাদি অনেক উচ্চ উচ্চ কথায় সকলের চিত্তকে মুগ্ধ করি সত্য, ফলতঃ কপটতার উৎপীড়নে যে পতঙ্গের ন্যায় পাপানলে পতিত হইতে হইবে, এটী কি এক মুহূর্ত্তের জন্যও আমাদের মনে হয় না! জগতের বিচিত্রতার প্রতি দৃষ্টি করিলে, এটী কি দেখা যায় না যে,ভঙ্গুর শরীরের স্থায়িত্ব কি? অসার আসক্তির উত্তেজনায় ভগবদ্ চিন্তায় ঔদাস্য থাকা কি উচিত হয়? মাঝে মাঝে যে ব্যাধি-দণ্ডের আঘাত পড়ে, ইহা কি ভাবিবার কথা নহে? কখন যে পৃথিবীর ধূলির সহিত মিশিতে হইবে, কে বলিতে পারে। যে সকল প্রিয় বস্তুর আসক্তিতে এত স্ফীত, সেই ক্ষণস্থায়ী প্রীতির বস্তুগুলি কি সঙ্গে যাইবে? সূচীটাও ত সঙ্গে যাইবে না; অতুল ঐশ্বর্য্য, শরীরের সৌন্দর্য্য, অসীম বলবীর্য্য কিছুই ত থাকিবে না।"

প্রশ্ন। সজন সম্মিলনে ও নির্জ্জনে ব্রহ্ম-সাধনের পার্থক্য কি? সাধনা মধ্যে আশ্রমিকের পক্ষে কোন্‌টী সহজ পন্থা?

উত্তর। "নির্জ্জন-অরণ্যাশ্রয়ী যোগিগণ ঐশীশক্তি সম্পৃক্ত ভ্রাতৃভাবে উদাসীন, তাঁহারা তীব্র বৈরাগ্যের দংশনে অধীর হইয়া গিরি-গুহা অবলম্বন করেন। পিতা-পুত্র বা সেব্য-সেবকের মধুরভাব পরিত্যাগ করিয়া তীব্র বৈরাগ্যের উত্তেজনায় কুম্ভকাদি যোগের অনুগামী হন, সুতরাং দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শ যোগের বিশুদ্ধ তত্ত্বে উপাস্য উপাসকের ভাব কতদূর স্থায়ী থাকে বলিতে পারি না। যাহা হউক, আবার সংসারের আসক্তি হইতে

সম্যক প্রকারে মুক্ত না হইলেও ঐ মহাযোগের অধিকার জন্মে না, তথাপি সাধুভক্তের সংসর্গ আবশ্যক।" মায়ামুগ্ধ মানব সতত মোহাদির বশীভূত, তজ্জন্য সৎসঙ্গ সুখ-সম্ভোগের প্রত্যাশী নহে, সুতরাং সাধন-সহায় সাধুসঙ্গের জন্য ব্যাকুল হয় না। তৃণখণ্ড স্থানে স্থানে পড়িয়া থাকে, তদ্দ্বারা কোন কার্য্যই হয় না বটে, কিন্তু ঐ সকল তৃণ একত্র রজ্জুভাবে পরিণত হইলে, তাহাতে প্রকাণ্ড হস্তীও নিবদ্ধ হয়। সাধু-সম্মিলন শক্তিতেও ভগবানকে হৃদয়ে বাঁধিয়া রাখিতে পারে, তবেই বলিতে হয়, নির্জ্জনেও সজনের প্রয়োজন। একটী তালার কলে মরিচা ধরিলে তাহাতে যদি তৈল প্রক্ষেপ করা যায়, সে আবার পূর্ব্ববৎ সুন্দর চলে। নির্জ্জনবাসী যোগীকেও হৃদয়-তালার কলটী শুষ্কতা মলায় না চলিলে সাধুসঙ্গে প্রেম-আজ্যে ভিজাইয়া লইতে হয়, তাহা হইলে বেশ চলিতে থাকে। তাই বলি, গিরি-গুহাবাসী কষ্টসহিষ্ণু কুম্ভক যোগী অপেক্ষা যাঁহারা সজন-সম্মিলন উদার প্রেমে যাহা কিছু লাভ করেন, তাহা জগতের নর-নারীগণকে বিতরণ করিয়া পরস্পর আদান প্রদানে সেবা-ব্রত পালন শিক্ষা দেন, তাহাই ত বিধেয়?

মিলনের অনৈক্যতাই দুঃখের কথা ও অভীষ্ট সিদ্ধির বিড়ম্বনা! সংসারে মানব-প্রকৃতি চারিটী ভাবে বিভক্ত। প্রথমটী শিশুভাবে যোগীভাব, দ্বিতীয়টী জগতের স্বার্থ শিক্ষায় তমোগুণক্লিষ্ট পশুভাব, তৃতীয়টী হিতাহিত নির্ব্বাচন শক্তি জন্মিলে মনুষ্যভাব, চতুর্থটী রজ ও তমোগুণের অতীত উদার সাত্বিক প্রেমের উদয় হইলে দেবভাব। এই দেবভাব প্রাপ্ত হইলেই জগৎকে আলিঙ্গন করিবার জন্য প্রাণ আকুল হইয়া উঠে। ইহার আবির্ভাব না হইলে হৃদয় নৈরাশ্যে পরিণত হয়। অতল সমুদ্র মধ্যে একটী অঙ্গুরীয় নিক্ষেপ করিলে যেমন পুনর্ব্বার হস্তগত না হইলে বিষাদের সীমা থাকে না, তেমনই ঐ দেবভাবের স্ফুর্ত্তি না হইলে সকলই বিফল। ঈশ্বর মানবগণকে শুভাশুভ বৃত্তিসমূহ

প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার ইঙ্গিত বুঝিলে বুঝা যায়, জড় তত্ত্বে জড়িত থাকিয়া পার্থিব ক্রিয়া সম্পন্ন করিলে বস্তুতঃই উহা দ্বারা কামনার কার্য্য ভিন্ন নিষ্কাম সাধনের উন্নতি হয় না। ইহাতে বরং ভ্রান্তি, অহঙ্কার, স্বার্থপরতা প্রভৃতি ভয়ঙ্কর বিষয়ই প্রবল করে, তজ্জন্য করুণাময় পরমেশ্বর সাধন বিঘ্নকারী কামাদি রিপুগণকে বশীভূত করিবার সুন্দর বিধানও করিয়াছেন। উহাদের শাসনের নিমিত্ত ধর্ম্ম ক্ষমা দয়া দাক্ষিণ্য ঔদার্য্য সারল্য এই ছয়টী মহদ্বৃত্তি দিয়া কতই যে কৃপার ব্যাপার দেখাইয়াছেন; ভাবিলে, প্রেমাশ্রু রাখিতে পারা যায় না।

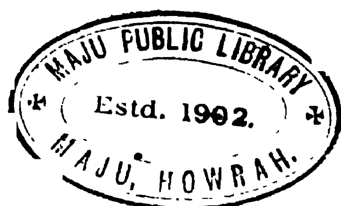
সকলের কর্ত্তব্য যে, সজনে কি নির্জ্জনে উপর্য্যুক্ত সৎগুণ দ্বারা রিপুগণকে সবশে রাখিবার জন্য চেষ্টা করেন। তাহা হইলে, আসঙ্গ লিপ্সাদি হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া বিশ্ব-জনীন প্রেমে প্রাণ উৎফুল্ল হইতে থাকিবে। দ্বেষ দম্ভ প্রভৃতিকেও দমনে রাখিয়া চিত্তকে সত্য-শৃঙ্খলে বাঁধিবার শক্তি জন্মিবে এবং সহজেই বিশ্বাস ও আসন দৃঢ় হইবে, সাধনে ব্যাহস্তা জৃম্ভিকাদির প্রাদুর্ভাব আর থাকিবে না, অল্প সময়েই ব্যাকুলতা, দীনতা, সহিষ্ণুতা ইহারা চরিত্রের ভূষণ হইবে, সাধন-পথে আর কোনই বিঘ্ন বিড়ম্বনা সম্ভবে না। কুপথদর্শীর সংসর্গ দূর হইয়া সত্যের জ্বলন্ত জ্যোতিঃ প্রাণে বিকাশ পাইবে।

এইরূপ অবস্থায় গিরিগুহাবাসী যোগীরাও কুম্ভ-যোগোপলক্ষে প্রয়াগাদি তীর্থক্ষেত্রে সাধু সম্মিলন সুখ সম্ভোগ করেন। পরস্পর স্বর্গীয়তত্ত্বে সাধনশক্তি বৃদ্ধি করিয়া লন। এস্থলে অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, নির্জ্জন সাধনেও সাধুসঙ্গের প্রয়োজন! কারণ, মঙ্গলময় বিধাতা প্রত্যেকের হৃদয়ে সম্মিলনের পবিত্র বীজ অঙ্কুরিত হইবার জন্য এক প্রাণতার মহামন্ত্র প্রদান করিয়াছেন। সুতরাং সকলেরই সজন সম্মিলনে ধর্ম্মবন্ধুর সহবাস একান্ত বাঞ্ছনীয়। মানুষ

ভাবে না যে, ধর্ম্মভেদ সুহৃদ্ভেদ মতভেদ এ সকল সাধন পথের বিড়ম্বনা। বাস্তবিক উদার সরল প্রেমের প্রকাশ না হইলে কখনই বৃত্তি সাধন, ইন্দ্রিয় দমন, চিত্ত সংযম সম্ভবে না। ভেদাশ্রয়ে অনন্ত পুরুষকে কে ধরিতে পারিয়াছেন? এই দেখুন, প্রেমিক ভক্তগণ তাঁহারা এতই সরল যে, সাধু-সাধ্বীর দর্শন পাইলে, অহেতুকী ভক্তিতে নতশির না হইয়া আর থাকিতে পারেন না। অন্ধ, খঞ্জ, ধনী, দরিদ্র, যোগী, ভোগী, মূচী, মুচী প্রভৃতি ভাই ভগিনীর পদধূলি গ্রহণ করিয়া ধন্য হন।

সজনে ও নির্জ্জনে উভয় ক্ষেত্রেই সেবার ভাব সাধন করা উচিত। চিত্তকে অবাত কম্পিত দীপ শিখার ন্যায় স্থির রাখিয়া মহাধ্যানে মগ্ন থাকাই সাধনের বিশুদ্ধ উপায়। যদি বলেন, এইরূপ ধ্যান-সাধনার পথ কি? উহার সহজ সাধনের একটী শিক্ষা আছে, একগাছি দড়ীতে একটী গরু বাঁধিয়া রাখিলে ঐ গরুটী কি বহু দূর ছুটিয়া যাইতে পারে, না ঐ স্থানটুকুর মধ্যেই ঘুরিতে থাকে। সেইরূপ সুদৃঢ় বিশ্বাস-কীলকে সত্য-রজ্জুতে চিত্তকে বাঁধিয়া সাধন করিলে কখনই বিঘ্ন হয় না। ক্রমে ক্রমে কামাদি রিপুগণকে বশে আনিলে সৎ প্রবৃত্তি সকল সাধনের সাহায্য করে। অতএব সজন সম্মিলন সমিতিতে হউক বা নির্জ্জন স্থানেই হউক সাধন বল প্রবল রাখা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। তাহা হইলে অকৃত্রিম ব্যাকুলতা জাগিয়া উঠিবে, শুভবৃত্তিগণ পরস্পর বিশুদ্ধ পথ দেখাইয়া দিবে, দেবভাবের আবির্ভাবে জগৎ মধুময় বোধ হইবে, দ্বেষ, হিংসা, স্বার্থপরতা প্রভৃতি দুষ্প্রবৃত্তি সমূহ আর আক্রমণ করিতে পারিবে না, অবিচ্ছিন্ন উদার-প্রেমে সকলকে আলিঙ্গন করিবার জন্য প্রাণ আকুল হইয়া উঠিবে।"

---




# অষ্টম পরিচ্ছেদ।

১২৯৬ সালে মাঘোৎসবের সময় কমলাকান্ত কলিকাতায় গমন করেন। কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে একখানি দ্বিতল গৃহে সে বৎসর সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের যাত্রী-নিবাস হইয়াছিল। নীচ তালায় ডাক্তারখানা, উপর-ঘরে মফঃসলবাসী ব্রাহ্মগণের থাকিবার স্থান নির্দ্দিষ্ট হয়। ঐ ঘরটীতে কয়টী কুঠরী, তাহার একটী কুঠরীতে কমলাকান্ত স্থান পাইলেন। মাঘোৎসব উপলক্ষে পূর্ব্ববঙ্গ, পশ্চিম বেহার, উড়িষ্যা প্রভৃতি নানাদেশ হইতে বন্ধুগণের সমাগম হয়। কমলাকান্ত সকলের নিকট পরিচিত হইয়া বড় সুখী হইলেন। একদিন শ্রদ্ধেয় দেবী প্রসন্ন রায় চৌধুরী মহাশয়ের সহিত তাঁহার আলাপ হইল। অনেক কথাবার্ত্তার পর কমলাকান্ত তাঁহাকে "একাত্মবাদ" মহত্তত্ত্বের দুটী তিনটী প্রশ্ন করিলেন। রায় চৌধুরী এমনই বিশদভাবে প্রশ্নোত্তর করেন যে, কমলাকান্ত তাঁহাকে আলিঙ্গন না করিয়া থাকিতে পারিলেন না। আহা! ধর্ম্মের মিলন কি মধুর! এত অল্প সময়ের মধ্যে গাঢ় প্রেমের আবির্ভাব আশ্চর্য্যেরই কথা! বস্তুতঃই প্রেম আপন পর সমান করিয়া দেয়। তাঁহারা পরস্পর ধর্ম্মতত্ত্বের আলোচনায় বড় প্রীতিলাভ করিলেন। এই সময়ে কমলাকান্ত ভগবদ্ভক্ত জগদীশচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের সহিত পরিচিত হইয়া তাঁহার সার গর্ভ ধর্ম্মতত্ত্বের আলোচনায় বড়ই আনন্দিত হন। এই সুযোগে কমলাকান্তের আর একটী সুবিধা হইল যে, উদার প্রেমের আধার রায় চৌধুরী মহোদয় "নব্যভারত" মাসিক পত্রে প্রবন্ধ প্রচার সম্বন্ধে আশা দিলেন। সমধর্ম্ম বন্ধুত্বের আকর্ষণী শক্তি অনিবার্য্য! ইঁহারা উভয়েই অপরিচিত,

দূর দূরান্তরে অবস্থিতি করিতে ছিলেন। একপ্রাণতার মহামন্ত্রে যেন এক হইয়া গেলেন। জগতে এইরূপ বন্ধু মিলনই বাঞ্ছনীয়।

যাত্রী নিবাসে অভয়চরণ ভর নামে একটী যুবক কমলাকান্তকে বড় শ্রদ্ধা ভক্তি করিতেন। এবং তাঁহার কাছে সর্ব্বদা থাকিতেন। সমাজে কি কোন স্থানে যাইতে হইলে সঙ্গ ছাড়া হইতেন না। কমলাকান্ত কলিকাতায় মাঘোৎসবে আসিয়া সহৃদয় ভাইটীর সরল ভাবে বড় আনন্দিত হইলেন। উৎসবের মধ্যেই একদিন কমলাকান্ত বলিলেন, "অভয়বাবু! আমার বহু দিনের একটী ইচ্ছা আছে, কলিকাতা মহানগরীতে তিনটী বীরমূর্ত্তি দর্শন করিব। এখন ত উপাসনার সময় নয় এই সময়ে গেলে কি হয় না!" অভয়বাবু বুঝিতে না পারিয়া বলিলেন, "আপনি কি গড়ের মাঠে কখন যান নাই? সেখানে ত অনেক বীর পুরুষ আছেন, তিনটী বীর কোথায়?" কমলাকান্ত ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "সে সকল তোপ বন্দুক গোলা গুলীর বীরের কথা বলিতেছি না! বাঙ্গালার সাহিত্য বীর, একেশ্বরবাদ ধর্ম্মবীর, উপনিষদবাদী ব্রাহ্মবীর দর্শনের কথা! আজ বঙ্গের সাহিত্য-বীরকে দেখিয়া আসি।" অভয়বাবু কৌতুকাবিষ্টচিত্তে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে বীর কোথায়?" কমলাকান্ত বলিলেন, "তিনি কোথায় থাকেন জানি না, তিনি গুণসাগর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।" অভয়বাবু আগ্রহসহকারে তখনই ভাল রাস্তায় কমলাকান্তকে লইয়া চলিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাড়ীর দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়াও তাঁহাদের আশা পূর্ণ হইল না। সেদিন তাঁহার বড় অসুখ, এক সপ্তাহের পর আসিতে আদেশ পাইলেন।

কমলাকান্ত প্রতিদিন ব্রহ্মোৎসবে যোগ দিতে ক্রুটী করেন না। একদা অভয়বাবুকে সঙ্গে লইয়া নির্দ্দিষ্ট দিনে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাড়ীর দ্বারে উপস্থিত হইলেন। কবাটের কড়াটী ২।৩ বার ঝাঁকি

দিলে একটী লোক আসিয়া উপস্থিত হইল। তাঁহারা সংবাদ দিতে বলিলেন। কিছুকাল পর জনৈক গৌরবর্ণ সুন্দর যুবাপুরুষ আসিয়া কমলাকান্ত ও অভয়বাবুকে উপরের ঘরে লইয়া গেলেন। একটী হলের মধ্যস্থলে একখানি টেবিল, তাহার চতুষ্পার্শ্বে বলয়াকারে সুন্দর সুন্দর চেয়ার রহিয়াছে। পার্শ্ব-কুঠরীতে প্রকাণ্ড লাইব্রেরী—অত্যুৎকৃষ্ট আলমারীতে অসংখ্য পুস্তক স্তরে স্তরে সাজান আছে। যুবকটী তাঁহাদিগকে ঐ স্থানে চেয়ারে বসিতে বলিলেন। আরও একটী ভদ্রলোক পূর্ব্ব হইতেই ছিলেন। কিছুকাল পর বিদ্যাসাগর মহাশয় আসিয়া কমলাকান্তের পার্শ্বস্থ চেয়ারে উপবেশন করিলেন।

কমলাকান্ত পূর্ব্বেই শুনিয়াছিলেন, বিদ্যাসাগর মহাশয় কোন প্রকার ধর্ম্ম লইয়া আলাপ করেন না, সুতরাং ধর্ম্ম সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিলেন না। বিদ্যাসাগর মহাশয় পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি সংক্ষেপে তাঁহার অবস্থোচিত সকল কথা ব্যক্ত করিয়া এই কথাটী বলিলেন, "আমি কোন স্কুলে বা সংস্কৃত টোলে পড়ি নাই। আপনার রচিত বাঙ্গালার প্রথম সাহিত্য শকুন্তলা, সীতার বনবাস প্রভৃতি পুস্তকের সাহায্যে যা কিছু বাঙ্গলা ভাষা বলিতে সক্ষম হইয়াছি। অধিক সময় আমার বন্ধুগণকে বলিতাম যে, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দর্শন লাভ এ হেন নিঃস্ব ব্যক্তির কি সম্ভব?" বিদ্যাসাগর মহাশয় হাসিয়া বলিলেন, "আপনি জানেন না সাগরে হাঙ্গর, কুম্ভীর, অনেক থাকে!" কমলাকান্ত উত্তর দিলেন "তাহাতে যে অমূল্য রত্নও থাকে!" বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রীতি সহকারে এই কথাটী জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি গৈরিক বস্ত্র কত দিন হইতে গ্রহণ করিয়াছেন?" কমলাকান্ত বলিলেন, "মাতার স্বর্গগমনের পর হইতে।" বিদ্যাসাগর মহাশয় আনন্দিত হইয়া বলিলেন, "বাড়ীতে আর কে আছেন?" কমলাকান্ত তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আমি আর ঈশ্বর!" বিদ্যাসাগর

মহাশয় এই কথাটীতে বড় আনন্দিত হইলেন এবং অনেক কথাবার্ত্তার পর অতি কাতর ভাবে বলিলেন, "আমার পেটের ব্যারামটী অনিবার্য্য হইয়া উঠিয়াছে।" কমলাকান্ত আর বিলম্ব করিলেন না, অভয়বাবুকে সঙ্গে লইয়া যাত্রী নিবাসে আসিলেন।

অভয়বাবু প্রত্যুষে কমলাকান্তকে বলিলেন, "মহাশয়! আজ সকালে সাধারণ ব্রহ্মসমাজে ব্রাহ্মিকাগণের উৎসব হইবে। ব্রাহ্মগণের জন্য ৭টার সময় সিটী কলেজে উপাসনা হওয়ার কথা আছে, সেখানে যোগ দিতে যাবেন কি?" কমলাকান্ত বলিলেন, "উৎসব প্রায় শেষ হইল অল্প দিন আছে, এই সময়টুকুর মধ্যে সেই একেশ্বরবাদ ধর্ম্মবীরকে দেখিয়া আসি।" অভয়বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে বীর আবার কে?" কমলাকান্ত বলিলেন, "তিনি ঋষিকল্প রামতনু লাহিড়ী।" অভয়বাবু তাঁহাকে দেখিবার জন্য বড়ই আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। আর বিলম্ব না করিয়া তাঁহারা উভয়ে চলিয়া গেলেন।

অভয়বাবু মৃজাপুর ষ্ট্রীটের অনতীদূরে একটী ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "রামতনু লাহিড়ী মহাশয় কোথায় থাকেন?" ভদ্রলোকটী অঙ্গুলি সঙ্কেতে দেখাইয়া দিলেন, "ঐ যে বড় বাড়ীটী!" অভয়বাবু বন্ধ কবাটের কড়া ধরিয়া কয়েকবার ঝাঁকি দিলেন। কিছুকাল পর একটী প্রাচীনা স্ত্রীলোক আসিয়া বলিল, আপনারা কোথা হইতে আসিয়াছেন? কমলাকান্ত বলিলেন, "আমি মুর্শিদাবাদ হইতে আসিয়াছি, লাহিড়ী মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিব।" বৃদ্ধাটী তৎক্ষণাৎ চলিয়া গেল, অল্প সময় মধ্যে আসিয়া তাঁহাদিগকে উপর তালায় লইয়া গিয়া হলে বসিতে বলিল। কমলাকান্ত ও অভয়বাবু ঐ হলের এক পার্শ্বে বসিলেন।

কিছুকাল পরেই শুভ্র শ্মশ্রু উজ্জ্বল গৌরবর্ণ অতি সৌম্যমূর্ত্তি লাহিড়ী মহাশয় ঐ ঘরে আগমন করতঃ তাঁহাদের এক পার্শ্বে

উপবেশনান্তর কমলাকান্তের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কলিকাতায় কোথায় থাকেন?” কমলাকান্ত অতি বিনীত-ভাবে বলিলেন মাঘোৎসব উপলক্ষে আসিয়া সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের যাত্রী নিবাসে আছি।” লাহিড়ী মহাশয় সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, “যাহা হউক এই উপলক্ষে আপনাদের সহিত সাক্ষাৎ হওয়াতে বড় সুখী হইলাম, আপনি কি ব্রাহ্ম?” কমলাকান্ত বলিলেন, “সেকি! আমি ঐ উচ্চ উপাধির যোগ্য নহি, তবে “একেশ্বরবাদ” ধর্ম্মটী বিশ্বাস করি। ব্রাহ্ম সমাজে যোগ দিয়া সুললিত মধুর সঙ্গীতে এবং উপাসকগণের উপাসনায় আধ্যাত্মিক মূর্ত্তি পূজাও বুঝিতেছি! বস্তুতঃই নিরাময় নিষ্কলঙ্ক নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনা শুনিলাম না।” লাহিড়ী মহাশয় কিঞ্চিৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, “আধ্যাত্মিক মূর্ত্তি পূজা কিরূপ? ব্রাহ্মগণ ত নিরাকারবাদী, কোন মূর্ত্তি পূজা করেন না! কমলাকান্ত বলিলেন জড়তত্ত্ব নির্ম্মিত মূর্ত্তি পূজা করেন না সত্য; কিন্তু নিরাকার তত্ত্বের ভিতরেও পার্থিব উপাদানে এক একটী মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া থাকেন। “মা তোমার প্রেম-মুখের স্নেহপূর্ণ পিযূষময় কথা শুনিয়া ধন্য হই। পিতঃ! তোমার মঙ্গল হস্তে আমাকে ধর, চরণ তলে স্থান দাও, চরণাঙ্গুলীর তলে”—এটিত বেশ ছাঁকা কথা! এই সকল ভাষায় আধ্যাত্মিকে কি মূর্ত্তি ভাব আইসে না? ইহাতে কি নিরাকার নিত্য চৈতন্যের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ গঠন করা হয় না? মাতৃভাবে দেবীমূর্ত্তি, পিতৃভাবে দেবমূর্ত্তির বিকাশ পায় না? লাহিড়ী মহাশয় বলিলেন, ও সকল কথা ভক্তির আবেগে আসিয়া পড়ে বস্তুতঃ তাঁহাদের হৃদয় নিরাকার ব্রহ্মোপাসনায় পূর্ণ। কমলাকান্ত ও কথায় পরিতৃপ্ত হইলেন না তখনি উত্তর দিলেন যে “আপনার কথা অবশ্যই স্বীকার করি, তবে কি বলিতে চান, ঐ রূপ উপাসনা একেশ্বরবাদ ধর্ম্মের ভিত্তি?” লাহিড়ী মহাশয় প্রীতিপূর্ণ বচনে

বলিলেন, "না, না, উটি অভ্যাসগত ভাষা উহা অবশ্যই পরিত্যাজ্য। সর্ব্বব্যাপী পরব্রহ্মকে কোন প্রকার রূপক কল্পনা দ্বারা সীমায় আনিতে পারা যায় না, ব্রহ্মোপাসনার ভাষা কোন প্রকার সীমায় বদ্ধ না হয় ইহাই প্রার্থনীয়। কিন্তু একটী কথা! জ্ঞানেন্দ্রিয়ের ভিতরে কার্য্য-কারিণী শক্তির প্রতি চিন্তা করিলে, "মঙ্গল-হস্ত, প্রেম-মুখ, কৃপা-নয়ন" এ সকল ভাষায় বিশেষ ক্ষতি হইবে বলিয়া মনে হয় না।"

কমলাকান্ত অতি বিনীত ভাবে উত্তর দিলেন, "মহাশয়! অবশ্যই ক্ষতি আছে। দেখুন! "একেশ্বরবাদ" ধর্ম্মের মূল সত্যটী রূপক-রূপ দ্বারা প্রচ্ছন্ন রাখিলে অনন্তব্যাপী মহান ঈশ্বরকে সীমা দ্বারা আবদ্ধ করা হয়। হস্ত পদাদি কর্ম্মেন্দ্রিয়ের মধ্যে যদিও এক অব্যয় অখণ্ড অস্পর্শ শক্তির কার্য্য হইতেছে তথাপি স্থূলেন্দ্রিয়ের পার্থিব প্রকৃতির প্রাবল্যে পূর্ণ শক্তিকে খণ্ডত্বে বিভক্ত করিবেই করিবে। তবে তর্ক উঠিতে পারে যে, জ্ঞান-চক্ষু অসীম, স্থূল-চক্ষু সসীম, এই উভয় চক্ষুর দৃষ্টি শক্তি একই চৈতন্যের স্ফূর্ত্তি; ইহাতে "দেখহ কৃপানয়নে" বলিতে বাধা কি! ইহার উত্তরে অবশ্যই বলিতে পারা যায় যে, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, মানবাদির শরীরাধারে একাত্মময় ঐশীশক্তি বিকাশ পাইতেছে, এমত স্থলে এটা পশু, ওটা কীট, উটি মানব এইরূপ দৈহিক ভাবের প্রভেদ ভাবে এত চিৎকার কেন? বস্তুতঃই পার্থিব পদার্থসঞ্জাত পৃথক্ জ্ঞানে, মহত্তত্ত্বের বিশ্লেষ সংঘটন হইয়া থাকে। এজন্য সতর্ক হওয়া উচিত! "হে প্রভো! তোমার চরণতলে স্থান দাও" এ কথাটার মূলে এটি কি সম্ভব হয় না যে, একটী পরিমিত বস্তু না হইলে তাহার ঊর্দ্ধ অধ প্রমাণ হয় না। বস্তুটী উপরে থাকিলে তাহার তলে আশ্রয় পায়, অনন্তের উচ্চ নীচ কোথায় থাকিবে? এই জন্যই বলিতে চাই, নিরাকার ব্রহ্ম-পূজার ভাষা স্বর্গীয়, পার্থিব নহে। রূপকাদি দ্বারা মূর্ত্তি কল্পনা করা সমীচীন বলিয়া মনে হয় না। কারণ, সূক্ষ্ম তত্ত্বও

স্থূলের আকর্ষণে জড়ভাবে জড়িত হইয়া পড়ে। অতঃপর সে জন্ত সাবধান থাকা উচিত। "একেশ্বরবাদ" ধর্ম্ম সাধনায় বিশুদ্ধ দেবভাষার প্রতি লক্ষ্য রাখা উপাসকগণের বাঞ্ছনীয়।"

ঋষিকল্প লাহিড়ী মহাশয় বলিলেন, "একেশ্বরবাদ ধর্ম্মে পশু, পক্ষী, মানবে অভিন্ন ও স্বর্গীয় দেব ভাষার বিষয় জানিতে ইচ্ছা করি। আমার মতের সহিত আপনার ধর্ম্মমতের অনেকটা ঐক্য হইলেও আপনি যে জগতের অস্তিত্ব স্বীকার করিতেছেন না, এ সম্বন্ধে কিছু বলিতে চাই। ঐ যে একখানি ক্ষুদ্র প্রস্তর হীরকখণ্ড উহার ভিতর হইতে অত্যুজ্জ্বল জ্যোতিঃ বাহির হইতেছে, ঐ গোলাপ ফুলটীর দিগ্ব্যাপ্ত পরিমল এবং অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য ছুটিতেছে, ইহাতে কি ব্রহ্ম-স্ফূর্ত্তি বুঝিব না? তবেই বলিতে হয়, ঐশীশক্তি জড়জগতেও জড়িত রহিয়াছে। বিশ্ব-বিচিত্রতাই ত ব্রহ্ম-স্থিতির প্রত্যক্ষ প্রমাণ! ব্রহ্মের সহিত সম্বন্ধ না থাকিলে, বৃক্ষ ফল প্রসব করিতেছে, স্বর্ণ-রজতাদি অচেতন ধাতুতেও কেমন সুন্দর জ্যোতিঃ বিকাশ পাইতেছে, এ সকল কখনই সম্ভব হইত না। "সাকারবাদ" ধর্ম্ম নিরাকারবাদীর পক্ষে সঙ্কীর্ণতা প্রদর্শন করে সত্য; ফলতঃ উহাতে নিত্য চৈতন্যের প্রকাশ ইহাও ত শাস্ত্রে বিবৃত আছে।"

কমলাকান্ত তদুত্তরে বলিয়াছিলেন, "একটী বালুকণাও ব্রহ্ম সত্তার আশ্রয় ব্যতীত থাকিতে পারে না, কিন্তু সাকাররূপে ব্রহ্মস্ফূর্ত্তি সম্বন্ধে বলিবার কথা আছে। কি উদ্ভিজ্জ জগতে! কি প্রাণী জগতে! সমুদ্র বিম্বের ন্যায় আবির্ভাব ও তিরোভাব দেখা যায়—এই অস্থায়ী ভাব-তরঙ্গের অস্তিত্বকে কি চিরস্থায়ী মনে করিতে পারেন? কখনই নহে। যদি বলেন, স্থূল শরীর ভিন্ন চৈতন্যের কার্য্য দেখা যায় না, ইহার উত্তরে স্পষ্টই বলিতে পারা যায় যে সমাধিস্থ যোগীর যোগ শরীরে শত শত আঘাত করিলেও অনুভব শক্তি বা বাহ্যজ্ঞান থাকে না। তবেই বুঝিবেন, পরিমিত জড়বস্তু ঈশ্বরের অস্পর্শ শক্তির প্রকাশ ব্যতীত আর

কিছুই নহে। এইজন্য যোগীরা, অন্তর্জগতে ধ্যান যোগে, বহির্জগৎকে গভীর অন্ধকার মধ্যে ডুবাইয়া দেন। একমাত্র অন্ধকারই আশ্রয় ও ধারণার উপায়। উহার ভিতরেই আবার অনন্ত আলো ফুটিয়া উঠে। বস্তুতঃই সাকার তত্ত্বের প্রতি দৃষ্টি পড়িলে জ্যোতিশ্চক্ষুরও অসীম দৃষ্টি-শক্তি ঐ স্থূলের ছায়ায় প্রচ্ছন্ন থাকে, সুতরাং অনন্তকে হারাইয়া যায়। তবেই বলিতেছিলাম, সাধনের উচ্চ সীমায় উপস্থিত হইলে যখন পরিমিত পদার্থ সমূহের চিহ্ন মাত্রও দেখা যায় না, তখন সাকার ধারণার প্রয়োজন কি? বিশেষতঃ শাস্ত্রেও কথিত আছে "বাহ্য পূজা ধমাধম।" পরিশেষে যোগী বা সাধককে সাকার-পন্থা পরিত্যাগ করিতেই হয়—ঐ পরমহংসকে দেখুন। এমত স্থলে অবশ্যই বলিতে পারা যায় যে, স্থূল ধারণা দ্বারা কেবল সময়পাত ব্যতীত আর কিছুই হয় না। সংসারে মহচ্ছাস্ত্রবিৎপণ্ডিতগণও ভঙ্গুর শরীরের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া একাত্মময় নিত্য চৈতন্যকে বিভিন্ন বুঝিতেছেন। কিন্তু সাম্যবাদী যোগিগণ প্রাণীজগতে একই ব্রহ্মচৈতন্যের প্রকাশ দেখিয়া প্রভেদ ভাব রাখেন না। অবলীলাক্রমে ঐ কুকুরটীর সঙ্গে একত্র ভোজনে পরিতৃপ্ত হন। তাঁহারাই "একেশ্বরবাদ" ধর্ম্মের অধিকারী। স্বর্গীয় দেব ভাষাও ঐ সকল যোগী জীবন হইতে বিকাশ পায়। মহর্ষি যীশু বলিয়াছেন, "পিতা আমাতে, আমি পিতাতে" এই মহত্তত্ত্ব মধ্যে প্রবেশ করিলে জানা যায়, পুত্রত্ব সত্তায় পিতৃ সত্তার যোগ অবিচ্ছিন্ন। এখন বুঝিয়া দেখুন, উভয় সত্তার যোগভাব "তুমি-আমি" একই চিচ্ছক্তি! মূলে স্বর্গীয় দেব ভাষায় "এক মেবা দ্বিতীয়ম্" ইহা ব্যতীত আর কিছু নাই। তবে যে ভৌতিক পরমাণু সম্ভূত কীটাদী পর্য্যন্ত বিবিধ দেহীর মধ্যে 'একাত্ম' তত্ত্বের বিভিন্ন ভাব দেখা যায়, উহাই মায়াত্মক ভ্রমপ্রমাদ! কারণ, বিশ্বনিয়ন্তার অচিন্ত্য কৌশল উপেক্ষা দ্বারা একমাত্র মানবেই ব্রহ্মশক্তির পূর্ণতায় পরিতৃপ্তি সিদ্ধান্ত করিলে, নিশ্চয়ই অন্ধ-

জ্ঞানের অন্ধকারে পড়িতে হয়। প্রত্যেক শরীরাধারে বিভূ-ভাবের বিকাশ পরিলক্ষিত হইতেছে, উহাকে অশ্রদ্ধা বা অনাদর না করিয়া যিনি অখণ্ড ব্রহ্মচৈতন্যকে দর্শন করেন তিনিই ধন্য! বাস্তবিক, বিবিধ প্রাণীর উপাধিভেদেও একই নির্ব্বিকল্প নিত্যপুরুষ বিরাজিত রহিয়াছেন। ইহাই ত প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞান। দৈহিকের ভিন্নতা সত্ত্বে সাম্যদৃষ্টির ব্যত্যয়, উহাই মারাত্মক!" এইরূপ বিবিধ ধর্ম্মালোচনায় লাহিড়ী মহাশয় বড়ই আহ্লাদিত হইয়া কমলাকান্তকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কলিকাতায় আর কত দিন থাকিবেন?" কমলাকান্ত বলিলেন, "উৎসব পর্য্যন্ত আছি, শীঘ্রই যাইব। অনুমতি করুন এখন আমি যাই" এই বলিয়া তথা হইতে বিদায় হইলেন।

উদ্যানোৎসবের পূর্ব্বদিন কমলাকান্ত বলিলেন, "অভয়বাবু! আজ সেই উপনিষদ্‌বাদী ব্রাহ্মবীরকে দর্শন করিয়া আসি।" অভয়বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথায় যাইতে হইবে—তিনি কে?" কমলাকান্ত বলিলেন, "তাঁহার নাম মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।" অভয়বাবু অতিশয় হৃষ্টমনে তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া চলিলেন।

পার্ক ষ্ট্রীটে আসিলে অভয়বাবু একটী যুবককে জিজ্ঞাসা করাতে তিনি মহর্ষি যে বাড়ীতে ছিলেন কিছুদূর সঙ্গে যাইয়া সেই বাড়ীটী দেখাইয়া দিলেন। দ্বারদেশে একজন দরয়ান বসিয়া ছিল। কমলাকান্ত তাহাকে বলিলেন, "আমি মুর্শিদাবাদ হইতে আসিয়াছি, মহর্ষির সহিত সাক্ষাৎ করিব।" দরয়ানটী বলিল, "আপলোক ঠাহরিয়ে, হাম পুছকে আয়ে।" কিছুকাল পর দরয়ানটী আসিয়া বলিল, "আপলোক আইয়ে।" তাঁহারা তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। যে ঘরে মহর্ষি থাকেন ঐ ঘরের নীচতালায় দপ্তরখানার কুঠরীতে উপস্থিত হইলেন।

সেখানে একটী কর্ম্মচারী ভদ্রলোক ছিলেন, উহাঁদিগকে চেয়ারে বসিতে বলিলেন। কিছুকাল পর একজন ভদ্রলোক তাঁহাদিগকে

উপরের ঘরে লইয়া গেলেন। মহর্ষি একখানি ইজি চেয়ারে উপবিষ্ট আছেন। দুই দিকে শ্রেণীভাবে ভাল ভাল চেয়ার সজ্জিত রহিয়াছে। কমলাকান্তকে মহর্ষির বামদিকের চেয়ারে বসিতে আদেশ করিলেন এবং অভয়বাবু তাঁহার বাম পার্শ্বে বসিলেন। সম্মুখ দেয়ালের গায় বড় রকমের ফ্রেমে একটী বৃদ্ধের ছবি চিত্রিত রহিয়াছে।

মহর্ষি* কমলাকান্তকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কি মুর্শিদাবাদের টাউনে থাকেন? গৈরিক বস্ত্র দেখিয়া বোধ হয় যেন আপনি গৃহত্যাগী উদাসীন।" কমলাকান্ত বলিলেন, "আমি টাউনেও থাকি না উদাসীনও নহি।" অল্প সময়ে সংক্ষেপে আত্ম পরিচয় দিলেন। মহর্ষি, ধোপা নাপিত বন্ধ নিবন্ধন শ্মশ্রু গোঁফ রাখা ও গৈরিক বস্ত্র পরিধানের কথা শুনিয়া হাসিয়া বলিলেন, "এরূপ না হইলে বিশ্বাসের ভিত্তি দৃঢ় হয় না। আপনি ব্রাহ্ম সন্ন্যাসী—আপনার পক্ষে "বসুধৈব কুটুম্বকং" ভালই করিয়াছেন।" এই বলিয়া উপনিষদে যে সকল ব্রাহ্মধর্ম্মের গভীর তত্ত্ব আছে তাহারই ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। সেই জীবন্ত তত্ত্বের আলোচনা এমনি সুন্দর ভাবে হইতেছিল যে, কমলাকান্ত তাহার ভিতরে ডুবিয়া গিয়াছিলেন। এমন সময়ে, ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের প্রধান প্রচারক প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় আসিয়া মহর্ষির দক্ষিণ পার্শ্বস্থিত চেয়ারে উপবেশন করিলেন। মহর্ষি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভাল ত?" তিনি বলিলেন, "হাঁ সকলি ভাল।" উপনিষদের ব্যাখ্যা আর হইল না, তাঁহারই সহিত অনেক্ষণ কথা হইতে লাগিল। শেষ উঠিবার সময় মহর্ষি মজুমদার মহাশয়কে অঙ্গুলি দ্বারা ফ্রেমটী দেখাইয়া বলিলেন, "দেখ ত! আমার চেহারার সহিত চিত্রটী মিলিতেছে কি না?" মজুমদার মহাশয়

* ইঁহার এই সময় দর্শন ও শ্রবণ শক্তি সুন্দর ছিল।

একটুকু আড়চক্ষে দেখিয়া বলিলেন, "অনেক ব্যত্যয় দেখিতেছি।" মহর্ষি বলিলেন, "ছেলেরাও ঐ কথাই বলিতেছে।" কিছুকাল পর সকলে চলিয়া গেলেন।

একদিন কমলাকান্ত সঞ্জীবনী পত্রিকার সম্পাদক শ্রদ্ধেয় কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয়ের বেনিয়াটুলির বাড়ীতে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান। সেখানে লক্ষ্ণৌ ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক লছমন প্রসাদ ছিলেন। নানাবিধ ধর্ম্মতত্ত্বের আলোচনা হইতেছিল, এমন সময়ে, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রধান প্রচারক পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় আসিয়া ঐ স্থানেই বসিলেন। "ভালরূপে প্রচার কার্য্য চলিতেছে না" এই সম্বন্ধে মিত্র মহোদয়ের সঙ্গে অনেক কথা বার্ত্তা হইল। একটু ফাঁক পাইয়া কমলাকান্ত শাস্ত্রী মহাশয়কে বলিলেন, "মহাশয়! আমার দুইটী কথা বলিবার আছে। প্রথম কথাটী এই, মহানগরী কলিকাতায় বহু সংখ্যক ভদ্র সন্তান বেশ্যাসক্তির ভীষণ আকর্ষণে বৃথা হইয়া যাইতেছে, তৎসম্বন্ধে আমি বলিতে চাই যে সঙ্গীত বিশারদ একজন সঙ্গী পাইলে ঐ সকল স্থানে মৃদঙ্গ বাজাইয়া ধর্ম্মোদ্দীপক সুললিত সঙ্গীত-সাহায্যে প্রচার করিতে পারিলে, অনেক যুবকের জীবন রক্ষা হইতে পারে এবং কুলটা রমণীদিগের মধ্যেও ধর্ম্মের স্রোত প্রবাহিত হয়।" শাস্ত্রী মহাশয় হাসিয়া উত্তর দিলেন, "আপনি বৃদ্ধ, সেই রাক্ষসীদিগের মুখ হইতে নিস্কৃতি পাইতে পারেন, কিন্তু গায়কটী যদি যুবা হয় তাহাকে যে একবারে "বে মালুম" গ্রাস করিয়া ফেলিবে, একথার কি বলেন? আপনি যে প্রস্তাবটী করিয়াছেন, বড়ই হিতজনক ও প্রয়োজনীয় এবং হৃদয়গ্রাহী. ফলতঃ এরূপ কার্য্যে দেখিতে পাই, অতি চরিত্রবান ব্রাহ্ম প্রচারক নীলমণি চক্রবর্ত্তী একজন উপযুক্ত। কিন্তু তিনিও যে খাসিয়া পর্ব্বতে থাকেন। বৃদ্ধের মধ্যে ভাল গায়ক একজনও দেখিতে পাইতেছি না। আর একটী কথা, যদি এই

মহদনুষ্ঠানে কৃতকার্য্য হওয়াই যায়, তবে ঐ বেশ্যা রমণীগণকে আশ্রয় দেওয়া ও তাহাদের ভরণ পোষণ করা বহু অর্থ সাপেক্ষ। যাহা হউক, প্রস্তাবটী অনাবশ্যক নহে। আর একটী কথা কি?"

কমলাকান্ত বলিলেন, "সে কথাটী এই, আপনারা নানা দেশে বড় বড় জায়গায় প্রচার করিতেছেন। অনেকের জীবনে ধর্ম্মভাব জ্বলন্ত ভাবে দিতেছেন সত্য; ফলতঃ তাঁহারা বাড়ী আসিলে প্রণয়িনীর "কান মলা"তে সেই ধর্ম্ম ভাবটী প্রাণে রাখিতে পারেন না, অল্পক্ষণ মধ্যেই আকাশে বিলীন হইয়া যায়। আপনারা বহুকষ্টে অনাহারে অনিদ্রায় দূর দূরান্তরে ভ্রমণ করিয়া যে একটুক ফল পাইতেছেন তাহা ঐ "কান মলা"তেই বৃথা হইতেছে। আমি বলি, একটী "ব্রাহ্ম প্রচারিকা" দল প্রস্তুত করুন যে ঐ সকল ব্রাহ্মিকারা এক একটী আত্মীয় সহ নানা স্থানে ভ্রমণ নিরতা হইয়া প্রত্যেক গৃহস্থের বাড়ীতে প্রাণগত আনুগত্য দ্বারা স্ত্রীলোকদিগকে ধর্ম্ম ভাবে শিক্ষিত করেন। তাহা হইলে পুরুষেরা নির্ব্বিঘ্নে ধর্ম্মকে হৃদয়ে গ্রহণ করিতে পারিবে। শাস্ত্রী মহাশয় প্রীতিপূর্ণ বচনে বলিলেন, "আপনি বড় ভাল কথা বলিয়াছেন কিন্তু ব্রাহ্ম সমাজের ব্রাহ্মিকাগণ বিলাসিতার তরঙ্গে ভাসিতেছেন, কে এমন আছেন যে ঐরূপ কষ্ট স্বীকার করিবেন?" এই সম্বন্ধে অনেক কথাবার্ত্তার পর সকলে আপন আপন স্থানে চলিয়া গেলেন।

উৎসব শেষ হইয়া গেল। ক্রমে ক্রমে ব্রাহ্মগণ সরিয়া পড়িলেন। অতি প্রত্যূষে একটী ব্রাহ্ম যুবক আসিয়া বলিলেন, "মহাশয়! আগামী কল্য হইতে আনন্দ বাজার ও যাত্রী নিবাসের ঘর বন্ধ হইবে।" ইহা শুনিয়া কমলাকন্ত তৎপর দিবসে ধুলিয়ান চলিয়া গেলেন।

---

# নবম পরিচ্ছেদ।

কমলাকান্তের ডাইরীতে একজন যুবকের সহিত যে কয়েকটী ধর্ম্ম বিষয়ের প্রশ্নোত্তর লিখিত ছিল; তাহা সকলের একটুকু জানিবারই কথা! তজ্জন্য এখানে অবিকল উদ্ধৃত করা গেল। সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের একটী ব্রাহ্ম যুবক কমলাকান্তকে বড় ভাল বাসিতেন। ব্রহ্ম-দাস তাঁহার ভাল বাসার আকর্ষণে ঐ সকল প্রশ্নোত্তর আহ্লাদের সহিত আপন ডাইরীতে লিখিয়া রাখেন। তাহাতে একটী যুবক বলিয়া উল্লেখ আছে, সুতরাং ব্রাহ্ম যুবকের নামটী এখানে প্রকাশ হইল না।

যুবক। আপনি কি এই জড় জগৎকে ভ্রম বিকার অর্থাৎ ইহার কোন অস্তিত্ব নাই মনে করেন? উহা সৃষ্টি প্রলয়ের অধিকারে নিয়মিত হইয়া থাকে এটী কি ভাবেন না? জড় তত্ত্ব কি একবারেই ব্রহ্মশক্তি হইতে ভিন্ন?

ব্রহ্মদাস। সেকি! ঐশী শক্তির বাহিরে কি কোন বস্তু থাকিতে পারে। ঈশ্বর যে অসীম ভূমা মহান্ অদ্বিতীয়। এমন কোথায় স্থান আছে যে সেখানে জড় বস্তু ধ্বংস হইবে! পরমাণু সমষ্টি জগৎ সমূহ তাঁহার ভিতরেই নিত্যকাল স্থিতি করিতেছে।

যুবক। আচ্ছা, সাকার তত্ত্ব যদি নিত্য বস্তুই হইল, তবে এই প্রস্তর খণ্ডকেও ত পূজা, আরাধণা করিলে অভীষ্ট সিদ্ধ হইতে পারে? কেননা, ঈশ্বরের মধ্যে যাই কিছু থাকনা কেন, সকলইত ব্রহ্ম অস্তিত্বে জড়িত সুতরাং নিরাকার ও সাকার উভয়ই পূর্ণ অস্তিত্বময় ব্রহ্ম— তবে মূর্ত্তি পূজাতেই বা দোষ কি? সকলের মধ্যেইত একই অখণ্ড চিৎশক্তি বিদ্যমান রহিয়াছে।

ব্রহ্মদাস। হাঁ, একথার মূলে একটী গভীর প্রতিবাদ আছে। অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, সাকার তত্ত্ব নিত্য বস্তু হইলেও নিত্যচৈতন্যের কার্য্য করিতে পারে না। তবে এটী সত্য যে, ব্রহ্ম-চৈতন্যের ভাব দুইটী ভাবে বিভক্ত। একটী প্রত্যক্ষ চৈতন্য—পশু পক্ষী মানবাদির শরীরাধারে, অপরটী অপ্রত্যক্ষ চৈতন্য—শাল, তাল, তমাল প্রভৃতি বৃক্ষাদি মধ্যে একই মহাশক্তির কার্য্য হইতেছে কিন্তু প্রত্যক্ষ চৈতন্য পরিত্যাগ করিয়া প্রচ্ছন্ন চৈতন্যকে গ্রহণ করা কি ঠিক্? সুতরাং প্রস্তরাদি স্থূল বস্তু লইয়া ব্রহ্মচৈতন্য বুঝিতে হইলে, অচেতনের সহিত চৈতন্যের সামঞ্জস্য ইহাও যে গভীর রহস্য! মানুষ চলিয়া যাইতেছে, বাক্সটী চলিতে পারে না, কথাও কয়না, তবেই বলিতে হয়, সাকারে ব্রহ্ম নির্লিপ্ত—আধারে পারদের ন্যায় অস্পর্শ ভাবে স্থিতি করিতেছেন, একথার কোনই সংশয় নাই।

যুবক। জগত্তত্ত্বের কথা একরূপ বুঝিলাম। এক্ষণে জীব-তত্ত্বের বিষয় কিছু জানিতে ইচ্ছা করি, উহার প্রকৃত তত্ত্ব কি বুঝাইয়া দিন। জীবের পৃথক্ পৃথক্ সৃষ্টি বিষয়টী সম্বন্ধে আপনি কি বলেন? স্থূলতত্ত্ব সমূহ বিশ্বলীলার উপাদান ভাবে যখন অনাদিকাল হইতে স্থিতি করিতেছে তখন সংসারে নিত্য পরমাণু সম্পৃক্ত দেহাধারে জীবের বহুত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ তরঙ্গে পড়িতে হইবে কেন? প্রাচীন ঋষিদিগের চিন্তালব্ধ পুরাণ প্রভৃতিতে দেখা যায়, জীবের সৃষ্টিভাব বহুত্বে প্রকটিত রহিয়াছে।

ব্রহ্মদাস। বুঝিলে অল্প কথাতেই মীমাংসা হইতে পারে। "জীব" অখণ্ড নিরাকার (আত্মা।) ঈশ্বর। জল ও তুষার যেমন নামের প্রভেদ ভাবেও উহা বস্তুতঃই জল, তেমনই জীব ও ব্রহ্ম একই শক্তির মূলে উপাস্য উপাসকের গূঢ় তত্ত্বও বুঝিবেন। কারণ, নিরাকার অখণ্ড অনাদি মহাচৈতন্য ভিন্ন আর কিছুই নাই সুতরাং জীবের সৃষ্টি হয় কিরূপে? মানব সকল বিকার বিচিত্রতায় মুগ্ধ হইয়া স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র

দেহীর প্রকাশে নিরাকার অখণ্ড ভাব-স্বরূপ জীবকে সৃষ্টির ভাবে বহুত্বে দর্শন করে।

যুবক। তবে সংসারে বিবিধ শ্রেণী বিভক্ত অর্থাৎ পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ সরিসৃপ মানবাদি ইহারা আসিতেছে, যাইতেছে, ইহাতে কি সৃষ্টি সংহার বুঝিব না?

ব্রহ্মদাস। ঐ ঘটটী ভাঙ্গিয়া গেল, আর একটী প্রকাশ পাইল, তাই বলিয়া কি আকাশের ঐরূপ অবস্থা? এখনই ত বলা হইল বিবিধ দেহীর স্বাতন্ত্র্য বিধানে এবং স্থূলের বিকার বিচিত্র ভাবেই জীবকে পৃথক্ রূপে প্রত্যক্ষ করে। এক সূর্য্যকে যেমন বহু পাত্রে বহুত্বেই দেখা যায়, তেমনই জীব-চৈতন্যকেও বহু প্রকার শরীরাধারে ঐরূপ ভ্রান্তি দর্শন হয়। বস্তুতঃ একই চৈতন্য সর্ব্বাধারে অখণ্ড ভাবে প্রকাশ পাইতেছেন।

যুবক। জীব সম্বন্ধে যে সকল কথা বলিলেন অনেক চিন্তার পর বুঝিলাম বটে কিন্তু তাহাতে একটী বড়ই নীরস ভাব আসিতেছে, বিশেষতঃ আপনার রচিত "সত্য-সঙ্গীত" মধ্যে "একি ভাব হরি" ইত্যাদি গানটীতে যেন আপনি একজন অদ্বৈতবাদী বলিয়া মনে হয়। একটু ভাবিয়া দেখুন ত; জীবের সৃষ্টি-সংহার না থাকিলে, পাপ তাপের জন্য ভজন সাধন এ সকল ঘুচিয়া যায়। প্রেম প্রীতি সেবা ভক্তি কিছুই ত থাকে না! কাজেই জীবের সৃষ্টি বিলোপ জনিত নীরস অদ্বৈতবাদে আমার বড় ভয় হয়।

ব্রহ্মদাস। আমি যে অদ্বৈতবাদী, ইহাতে আপনার ভয়ের কারণ কি! নিরাকার আত্মা ত কখন খণ্ড হয় না? সত্যের প্রকৃত তত্ত্বের প্রতি অনুসন্ধিৎসু হইলে, কেমন করিয়া অখণ্ড জীবশক্তিকে খণ্ড বিখণ্ড বিভক্ত করা যায়। অসীমাকাশকে কেহ কি কখন পৃথক্ পৃথক্ ভাবে রাখিতে পারে? একই ব্রহ্মচৈতন্য অসীম জীবচৈতন্য রূপে

সেব্য-সেবকের মধুর ভাবে মগ্ন রহিয়াছেন। পূর্ণপ্রেম স্বরূপ ঈশ্বরই আবার প্রেমের ভিখারী হইয়া প্রেম প্রার্থনা করেন। আহা! এই গূঢ় রহস্যতত্ত্ব জ্ঞানীভক্ত বা যোগী ভিন্ন কে বুঝিবে? চৈতন্য-চরিতামৃত কি বলিতেছেন—

"আপন মাধুর্য্য হরে আপনার মন,
আপনা আপনি চাহে করিতে আলিঙ্গন।"

ইহাতে কি অখণ্ড দ্বৈতাদ্বৈতের তত্ত্ব প্রকাশ পাইতেছে না? জ্ঞানিগণ জ্যোতিশ্চক্ষুতে এক ব্রহ্মকেই "সত্যম্ জ্ঞান মনন্তম" স্বরূপাদির নামভেদেও একই অদ্বিতীয় ব্রহ্মকে দর্শন করেন। অনন্ত ঐশীশক্তিই অখণ্ড জীব-ভাবে প্রকাশিত সুতরাং জীবে-ব্রহ্মে অভিন্ন সত্ত্বেও উপাস্য-উপাসক, সন্দেহ নাই। অচিন্ত্য লীলাবিচিত্রতার ভিতরে প্রবেশ শক্তি জন্মিলে বুঝা যায়, আমাদের ক্ষুদ্র হৃদয়ে যখন নানা বিষয়িনী চিন্তা দ্বারা বিবিধ তত্ত্বের উত্তর প্রত্যুত্তর চলিতে পারে, তখন অসীম কর্ম্ম কর্ম্মঠ অনাদি পুরুষ অখণ্ড দ্বৈতাদ্বৈত ভাবে সেব্য সেবক হইয়া আপনাকে আপনি সম্ভোগ করিতে পারেন না? নিশ্চয়ই বলিতে পারা যায়, জাগতিক মোহ-মরীচিকাময় ভ্রমভাব বিদূরিত হইলে পরিমিত স্থূলের ছায়া কিছু থাকে না। সত্যজ্ঞানের প্রকাশে নিষ্কলঙ্ক নিরাকার নিত্য চৈতন্যই স্বরূপও ভাবের মধুর মিলনে পরিতৃপ্ত হন। বস্তুতঃই এই দেব জ্যোতিঃতেই আমিত্ব পাকা হয় অর্থাৎ সিদ্ধামিত্ব হইয়া জীবের আশ্রয় গ্রহণ করে। তখনই "আমি তুমির" অব্যয় মধুর ভাব প্রকাশ পায়। তবেই বুঝুন, এক ব্রহ্মস্বরূপেই অখণ্ড দ্বৈতাদ্বৈত ভাবের মহালীলা প্রকাশ পাইতেছে। আমরা মানবীয় ভাবের ভিতরে থাকিয়া অভ্রান্ত স্বর্গীয় তত্ত্বের গূঢ়তত্ত্ব বুঝিতে পারি না। যাক্ এখানে এ বিষয় অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই। তবে এ কথাটি বুঝিয়া রাখা কর্ত্তব্য যে, ভেদজ্ঞানই ভ্রান্তির বন্ধুর পথে লইয়া

যায়। উহাতেই নিরেট স্থূল দ্বৈতকে প্রবল করে এবং তত্ত্বজ্ঞান প্রাণে ফুটিতে দেয় না। নিশ্চয়ই জানিবেন, তন্ময় "একাত্ম" মহা মিলনেও ব্রহ্মচৈতন্য ও জীবচৈতন্যের লীলাভাব বিনাশ হয় না। এখানে বিচার জ্ঞান পরাস্থ! যোগী তর্ক-যুক্তির অতীত স্থানে অব্যক্ত অনন্ত আলোকে ডুবিয়া যান। এবং সচ্চিদানন্দ নিত্য স্বরূপের সহিত অবিচ্ছিন্ন যোগে সিদ্ধ মনোরথ হন।

যুবক। এ সকল দর্শন তত্ত্বের আন্দোলনে আমার মত লোকের প্রাণে যেন ব্যবহারিক ভাবে নীরসভাব এসেই থাকে। আর সময় বেশী নাই, এই কয়টী কথার সংক্ষেপে উত্তর দিন। কিরূপ অনুষ্ঠানে বিশ্বাস জন্মে ও দৃঢ়ভাব স্থায়ী হয়, তাহার সাধনাইবা কি বলুন।

ব্রহ্মদাস। একবিন্দু শোণিত-শুক্রে মাতৃগর্ভে অপূর্ব্ব পঞ্জর-সজ্জিত শরীর-গঠন কেমন করিয়া হইল? বৃক্ষপল্লবের সূক্ষ্ম শিরায় কারিকুরি কে করিল? সরিষোপমবীজ হইতে প্রকাণ্ড বটবৃক্ষ, সূক্ষ্ম কীটে বিবিধ প্রকার জন্তু, কাহার ইচ্ছায় প্রকাশ পাইল? এই সকল চিন্তা করিলে, ইহার মূলে একটা অনন্ত শক্তি আছে বলিয়া প্রাণে আঘাত করে। তবে তর্ক উপস্থিত হইতে পারে যে, স্বভাবে ঐরূপ হইয়া থাকে। "স্বভাব" সেটা কি? উহাই ঐশীশক্তি মহা চৈতন্য নিরাকার নিত্য। কেননা, যাহার শক্তি আছে তাহার ভাবও আছে। স্ব—ভাব, অর্থাৎ স্বয়ং—"স্বরূপ"। ঈদৃশ জীবন্ত ভাবে যতই উন্মত্ত হইবেন, ততই বিশ্বাস ঘন হইতে থাকিবে। আত্ম চিন্তাই বিশ্বাসের সাধন।

যুবক। অনুরাগের সাধন কি বলুন। ঈশ্বরের প্রতি ঐকান্তিক অনুরাগ কেমন করিয়া আইসে এবং তাহার সহজ উপায় কি একটু সরল ভাবে বলিলে ভাল হয়।

ব্রহ্মদাস। বাস্তবিকই এটী সহজ ভাবের ভিতর দিয়া আইসে। সংসারাসক্তির মধ্যে অনুরাগ নিয়ত বিচরণ করিতেছে। স্ত্রী, পুত্র,

ধনৈশ্বর্য্যে এবং বারবণিতার প্রেমের ভিতরেও অনুরাগ ক্রীড়া করিতেছে। শ্মশান বৈরাগ্যকে আশ্রয় করিয়া ঐ সকল হইতে চিত্তকে ঈশ্বরে ফিরাইলেই সেই অনুরাগই হৃদয়কে আশ্রয় করে। ইহার সাধন একমাত্র ঐ শ্মশান বৈরাগ্য।

যুবক। ব্যাকুলতাকে ধরিবার পন্থা কি? কাহাকে আশ্রয় করিলে তাহার সহিত একত্র হওয়া যায় এবং বিশ্বজনীন বিশুদ্ধ প্রেম জন্মে।

ব্রহ্মদাস। বিশুদ্ধ বিশ্বাসই ইহার পথ প্রদর্শক। বিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গেই অকৃত্রিম ব্যাকুলতা প্রাণকে অধিকার করে। "প্রভুকে না দেখিলে আর বাঁচি না" এইরূপ অবস্থাই ব্যাকুলতাকে ধরিবার একমাত্র উপায়। বিশ্বাসের ভিত্তি যতই দৃঢ় হইবে ততই ব্যাকুলতা ব্যাকুল হইয়া প্রাণকে আকুল করিবে। তখন কিছুতেই বাধা মানিবে না, প্রেম, প্রীতি, ভক্তির উপহার আর না দিয়া ক্ষণকালও থাকিতে পারিবে না।

যুবক। আক্ষেপ করিয়া বলিলেন, "সন্ধ্যা হইল, আর সময় নাই, আলোচনার কথা আরও অনেক রহিল, তবে এখন যাই।"

ব্রহ্মদাস। সন্তোষ হইয়া বলিলেন, "ভগবানের ইচ্ছা পূর্ণ হউক। আজ বড় কৃতার্থ হইলাম। এইরূপ যুবক হইতে যে এমন গভীর প্রশ্ন, প্রায় শুনা যায় না, ঈশ্বর মঙ্গল করুন।"

---

# দশম পরিচ্ছেদ।

হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টীয়ান প্রভৃতি ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে যে সকল ব্যক্তির সহিত কমলাকান্তের প্রচারানুগত্য হয়, তাহার সার ভাগ সংক্ষেপে বলিতেছি। ইহাতে অতি রঞ্জিত কথা কিছু নাই।

**সাকারবাদী ও নিরাকারবাদীর কোলাকুলি**—কমলাকান্ত এক সময় বোলপুর শ্রদ্ধেয় হরিদাস বসু উকীল মহোদয়ের বাসায় উপস্থিত ছিলেন। তখন একটী যুবক তাঁহার সম্মুখে আসিয়া বলিলেন, "মহাশয়! আপনাকে আমাদের গোঁসাই ঠাকুর ডাকিতেছেন, একবার চলুন।" কমলাকান্ত ঐ যুবকটীর সঙ্গে একজন প্রাচীন উকীলের বাসায় উপস্থিত হইলেন। ঐ বৃদ্ধ উকীলটী কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া বৈষ্ণব-ধর্ম্ম সাধন করিতেছেন, তাঁহারই পুত্র ব্রহ্মদাসকে ডাকিয়া আনেন। সেই বাড়ীতে একজন উজ্জ্বল গৌরবর্ণ স্থূলকায় ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন, তাঁহার কণ্ঠদেশ তুলসী-মালায় সুশোভিত, নাসিকা হইতে ললাট পর্য্যন্ত শুভ্র তিলকের রেখা, উভয় গণ্ডে হরিনামের ছাপা, ফলতঃ তিনি সাকারবাদী সারগ্রাহী সরল বিশ্বাসী ভগবদ্ভক্ত। তাঁহার শরীরে অষ্ট সাত্ত্বিক ভাবের মধ্যে অশ্রু, কম্প, মত্ততার অকৃত্রিম লক্ষণ দেখা গিয়াছিল। কমলাকান্তের সহিত অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত ধর্ম্মতত্ত্বের আলোচনার পর পরিশেষে তাঁহাকে বড় প্রীতি সহকারে একটী গান করিতে অনুরোধ করিলেন। কমলাকান্ত সেই ভগবদ্ভক্তের আজ্ঞা পালন করা কর্ত্তব্য বুঝিয়া তাঁহার নীরসকণ্ঠে বাউল ও কীর্ত্তন সুরে স্বরচিত গান আরম্ভ করিলেন। কি আশ্চর্য্য! প্রেমে উভয়েই উভয়ের গলা ধরিয়া উন্মত্ত-ভাবে নৃত্য করিতে লাগিলেন! বলিতে কি, নৃত্য আর থামে না। সেদিন প্রভুর প্রেম-স্বরূপের প্রকাশে কৃতার্থ হইলেন। নৃত্য ভঙ্গ হইলে তাঁহারা কোলাকুলি করিয়া যার পর নাই আনন্দ সম্ভোগ করিলেন।

**অবধূত ভক্তের সহিত মিলন**—আরঙ্গাবাদ গ্রামে কোন সময় শ্রদ্ধেয় নন্দলাল পাল ডাক্তার মহোদয় চিকিৎসা করিতেন। একদিন কমলাকান্ত তাঁহার বাসায় উপস্থিত হন। নন্দবাবু তাঁহাকে

পাইয়া বড় আহ্লাদিত হইলেম। অনেক কথাবার্ত্তার পর বলিলেন, "এখানে বাউল পন্থী কয়েকটী বৈষ্ণব আছেন, একবার তাঁহাদের সহিত আলাপ করিলে বোধ হয় প্রীতি পাইবেন।" ব্রহ্মদাস বলিলেন, "ক্ষতি কি—তবে চলুন।" নন্দবাবু সেখানে না গিয়া তাঁহাদিগকেই আসিবার জন্য সংবাদ দিলেন। অল্প সময় মধ্যেই কৃষ্ণদাস, ধনকৃষ্ণ দাস, জয়কৃষ্ণ দাস প্রভৃতি অবধূত ভক্তেরা "অবধূত" নাম উচ্চারণ করিয়া তথায় আসিলেন। তাঁহাদের প্রাণে নিরাকার নিত্য চৈতন্যের ভাব আছে সত্য, তথাপি আসক্তির উত্তেজনায় মাঝে মাঝে সাকারবাদের ভাবটীও বলিতে ছাড়েন না। যাহা হউক, প্রথমতঃ "দেহধারী" পূর্ণ কি অপূর্ণ তাহারই আলোচনা আরম্ভ হইল।

কমলাকান্ত প্রীতি ও শ্রদ্ধার সহিত বলিলেন, "আত্মা যখন অচ্ছেদ্য অভেদ্য অখণ্ড নিরাকার, তখন অংশই বা কিরূপে সিদ্ধান্ত হইতে পারে? কেননা, শোণিত-শুক্রময় শরীরে জরা-মরণের অধিকারে কি ঈশ্বর কখন থাকিতে পারেন? তাঁহারই যে অব্যাহত অনন্তব্যাপিনী শক্তি অতি সূক্ষ্ম কীটাণু পর্য্যন্ত ভেদ করিয়া রহিয়াছে, ইহা বিশ্বাস করিলে সকলই ত ঈশ্বর! তবে পাত্রভেদ বা শক্তি বিশেষে যদি প্রেম ভক্তি শ্রদ্ধানুরাগাদির বিভিন্ন ভাব দেখিয়া বলেন যে, শাস্ত্রমধ্যে অবতারবাদের জলন্ত দৃষ্টান্ত সমূহ বিশদরূপে বিবৃত রহিয়াছে, কিন্তু নির্বিষ্ট মনে চিন্তা করিয়া দেখিলে, স্পষ্টই জানা যায়, উটি কেবল লোকপ্রবুদ্ধ আশু তৃপ্তির কথা! গীতা এই কথাই ত বলিতেছেন—

"পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায়চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।"

ইহার উত্তরে কি এ কথা বলা যাইতে পারে না যে, অনন্তব্যাপী ঈশ্বর আবার সময় ও কালের ব্যবচ্ছিন্নে থাকিবেন কিরূপে? জরা-মরণের যন্ত্রণাই বা ভোগ করিবেন কেন? অপূর্ণ মানব শরীরে একবিন্দু

দেবভাবের স্ফূর্ত্তি পাইলেই কি মানুষ পূর্ণ? একটী ক্ষুদ্র পাত্রে অকূল সমুদ্রের সম্যক্ জল কি সঙ্কুলন হইয়া থাকে? এখানে কে ঈশ্বর! ঐ মহাকাশব্যাপী মহাচৈতন্য না ভঙ্গুর শরীরটী? যদি তাহাই বিশ্বাস করিতে হয়, তবে পশু পক্ষী কীটাদি সকলেই ত অবতার! কারণ, পরমাত্মার প্রকাশ, প্রাণি-সমূহের মধ্যে বিভিন্ন নাই। নন্দ-নন্দন কৃষ্ণ, নির্ব্বাণধর্ম্মবীর বুদ্ধ, শচীপুত্র গৌরাঙ্গ—ইহাঁরা সকলে কোথায়? তাই বলিতেছি, যিনিই কেন হউন না, সকলেরই ভৌতিক পদার্থময় শরীর পৃথিবীতে মিশিয়া যায়। কিন্তু অদ্বিতীয় নিত্যচৈতন্য অগ্রেও ছিলেন, এখনও আছেন। এ কথা নিশ্চয় বলিতে পারা যায় যে, মহাজ্ঞানের উজ্জ্বল চক্ষু বিকাশ পাইলে পরিমিত গ্রহ উপগ্রহের গতি-নিবন্ধন দিবারাত্রি, যুগসংখ্যা প্রভৃতি সময়-কাল মহাকালের মধ্যে বিলীন হইয়া যায়। আমরা ইহা বুঝিতে না পারিয়া নানা কথা বলিয়া থাকি। নিরাকার সর্ব্বব্যাপিণী চিচ্ছক্তি যে খণ্ড বিখণ্ডে বিভক্ত হয় না, এ সত্য প্রাণে আমরা ধারণা করিতে চাহি না; কিন্তু একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে অবতারবাদেরও গূঢ় রহস্য হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে। ইহা শুনিয়া কৃষ্ণদাস বাবাজী স্পষ্টই বলিলেন "বাস্তবিকই ভক্তির আবেগে স্থূল-শরীর-ভাবটী আমরা ছাড়িতে পারি না। বাহ্যপূজার আপাততৃপ্তির আতিশয্য বশতঃ ঐ ভাবটীতে প্রাণকে বড় আকুল করে, ইহা হইতে দূরে থাকাই কর্ত্তব্য। আপনি মেদ-মাংস-শোণিত-শুক্রময়-শরীর সম্বন্ধে যাহা বুঝাইলেন, ইহাতে সংশয়ের কথা কিছু নাই।" এইরূপ অনেক আলোচনার পর অবধূত ভক্তেরা মানব শরীরের অপূর্ণত্ব স্বীকার করিলেন। ঐ সময় কমলাকান্ত আর একটী কথা উত্থাপন করিলেন যে "সন্ন্যাস ধর্ম্মে "স্ত্রী-সংসর্গ মহাপাপ"—এ সম্বন্ধে আপনারা কি বলেন? বৈষ্ণব গ্রন্থের এই দুইটী পদ্য অবশ্যই আপনারা জানেন"—

"প্রকৃতি হইয়া করে প্রকৃতি সম্ভাষণ,
প্রভু কহে তার মুখ না হেরি কদাচন।"
(চৈতন্যচরিতামৃত)

ইহাও ত অবধূতই বলিয়াছেন। তবে কেন ঘৃণিত পাপ ভাব ধরিয়া এমন বিশুদ্ধ নির্ম্মল ধর্ম্মকে কলঙ্কিত করা হয়। স্ত্রী সংসর্গ সংসাধনে একটু বীরত্ব আছে বটে, কিন্তু সন্ন্যাস ধর্ম্মে যে তাহা একেবারেই নিষেধ। এমন কি, স্পর্শ দোষ জনিত নরক ভোগ, একথায় আপনারা কি বলেন? ইহা শুনিয়া অবধূত ভক্তেরা অবাক্ ও স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। কিছুকাল পর কৃষ্ণদাস বাবাজী আর কোন কথা না বলিয়া এই মাত্র বলিলেন, "আপনি কোথায় থাকেন?" নন্দবাবু কমলাকান্তের সমস্ত পরিচয় দিয়া বলিলেন, "কথাটি ত বুঝিয়াছেন?" কৃষ্ণদাস উত্তর দিলেন, "হাঁ উটি ঠিক কথা! তবে কেন যে সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাস ধর্ম্মে ঐরূপ সাধনটা এল, জানিনা।" কমলাকান্ত তদুত্তরে বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন যে, ত্যাগী অবস্থায় স্ত্রী-গ্রহণ সাধন-বিষয়ে ঐ 'স্ত্রী,' নিজের সুখ-তৃপ্তির অনুসঙ্গিনী বটে, কিন্তু ধর্ম্মের বিরোধিনী, একথার সংশয় নাই। এই কথাটী শুনিয়া অবধি তাঁহাদের সকলেরই প্রাণে একটী ভয়ানক সংশয় জন্মিল। অল্প সময়েই নিরাকার নিত্য তত্ত্ব জ্ঞানের আলোকে তাঁহাদের হৃদয় আলোকিত হইয়া উঠিল। তখন হইতে তাঁহারা সময়ে সময়ে কাঞ্চনতলা কমলাকান্তের ক্ষুদ্র আশ্রমে ও ধুলিয়ান ব্রাহ্মসমাজে আসিতে আরম্ভ করিলেন। বলিতে কি, হরিনাম কীর্ত্তনে তাঁহারা সকলকে বিহ্বল করিয়া তুলিলেন এবং ব্রহ্মোপসনায় যোগ দিতেও লাগিলেন। এইরূপে অবধূত ভক্তগণের সঙ্গে কমলাকান্তের ধর্ম্মভাবে মিলন হইল, কোন একটা অনুষ্ঠান হইলেই তাঁহাদিগকে আহ্বান করিতেন। তাঁহারা আসিয়া তাঁহাকে বড় কৃতার্থ করিতেন।

তান্ত্রিকের সহিত আন্তরিক ভালবাসা—কোন সময়

একজন তান্ত্রিকের সহিত কমলাকান্তের সাক্ষাৎ হয়। অনেক কথা বার্ত্তার পর, তান্ত্রিক ঠাকুরকে কমলাকান্ত এই কথাটী জিজ্ঞাসা করিলেন মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে বর্ণিত আছে, কোন প্রকার মূর্ত্তি কল্পনা দ্বারা জগন্মাতার পূজা নিষিদ্ধ—

"মনসা কল্পিতা মূর্ত্তি র্নৃণাঞ্চেন্মোক্ষ সাধনী।
স্বপ্নলব্ধেন রাজ্যেন, রাজানো মানবাস্তদা॥"

এই মহামন্ত্র উপেক্ষা করিয়া নির্ম্মিত মূর্ত্তি পূজার জন্য এত আগ্রহ কেন? মনঃকল্পিত মূর্ত্তি দ্বারা যদি মুক্তি হয় তবে স্বপ্নেও রাজত্ব লাভে সুখী হইতে পারে। ইহাতে কি পরিমিত প্রতিমা পূজায় অভীষ্ট সিদ্ধির সম্ভাবনা আছে? পৃথিবীতে জ্ঞানী ধ্যানী যোগী ভক্ত ও সাধকদিগের মধ্যে অনেকেরই ত ঐরূপ সাকার পূজার প্রতি ঐকান্তিক বিশ্বাস দেখা যায়। ইহার ভিতরের গূঢ়তত্ত্বটী আপনি দয়া করিয়া বলুন।

তান্ত্রিক ঠাকুর অতি সন্তোষের সহিত উত্তর করিলেন, "দেখুন! বেদান্ত দর্শন একবারে জড় জগৎকে ভ্রমময় বলিয়া পরিত্যাগ করেন. ফলতঃ উহা প্রকৃত মীমাংসার কথা নহে। ভাবিয়া দেখিলে স্থূল পরমাণুও যখন চিরসত্তার বস্তু তখন মহাশক্তি হইতে উহা পৃথক থাকিতে পারে না।— সুতরাং জড় ও অজড় উভয়ই মণি-কাঞ্চনের ন্যায় জড়িত রহিয়াছে। একটী শিলাখণ্ডেও দেবীর সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ বুঝিলে সিদ্ধ মনোরথ হইতে পারে, সন্দেহ নাই।"

তন্ত্রবিৎ সাধক মহাশয়ের কথা শুনিয়া কমলাকান্ত বলিলেন, "এ সম্বন্ধে বলিবার কথা আছে। চৈতন্যশক্তি জড় ও অজড় উভয় সত্তাশ্রিত সত্বেও দুইটী ভাবে স্থিতি করিতেছে। একটী দেহাশ্রিত প্রাণীমধ্যে জীবন্ত চৈতন্য প্রত্যক্ষ, অপরটী স্থাবর-জঙ্গমাদি পদার্থে অপ্রত্যক্ষ, বস্তুতঃ একই শক্তি চেতন-অচেতনের ক্রিয়া প্রদর্শন করিতেছে, ইহাতে কি আপনি প্রত্যক্ষ পরিত্যাগ করিয়া অপ্রত্যক্ষের প্রতি লক্ষ্য করা শ্রেয়ঃ মনে করেন?"

তান্ত্রিক ঠাকুর বলিলেন, "দোষ কি! এক মহাশক্তি যখন স্থূলের মূলেও কার্য্য করিতেছে, তখন চিত্তের একাগ্রতা নিবন্ধন সম্মুখে একটী মূর্ত্তি থাকিলেই বা ক্ষতি কি? টেলিগ্রামের তারে তাড়িতবলে দূর দূরান্তরের সংবাদ আসিতেছে যাইতেছে, তবে মহাশক্তি জড়িত নির্ম্মিত মূর্ত্তিতেও ঐরূপ সম্ভব কেন হইবে না! জড়মূর্ত্তিতেও চৈতন্যের স্ফূর্ত্তি অসম্ভবের কথা নহে।"

কমলাকান্ত কৌলবিৎ সাধকের ঐ সকল কথা শুনিয়া বলিলেন, "ভাল কথা! আপনার ঐ জলশূন্য কমণ্ডলুটীকে বলিতেছি, "আমার জলের প্রয়োজন শীঘ্র জল চাই"—কৈ কমণ্ডলুটী ত জল দিতে পারিল না! বিদ্যুৎ যোগে সংবাদ দিলে বহুদূর যায় সত্য. কিন্তু তাহাতে চৈতন্যের ক্রিয়া সম্পন্ন করিতে পারে না। বিজ্ঞান কৌশলে ফনোগ্রাফ যন্ত্রে মানুষের মত কথাবার্ত্তা ও সঙ্গীতাদি শুনা যায় বটে, ফলতঃ উহা জড়বিজ্ঞানের সংমিশ্রনে রাসায়নিক পদার্থ এবং বায়ু-তরঙ্গাদির দ্বারা সংগঠিত। সুতরাং উহা হইতে চৈতন্যশক্তির কার্য্য হয় না। পরিমিত স্থূলপদার্থের সংযোগে চালিত হইয়াও উহা চৈতন্যশক্তির নিকট পরাভূত। কেননা, সীমাবদ্ধ বিজ্ঞান ক্রিয়া ক্ষণস্থায়ী. এ কথা সকলেই স্বীকার করিবেন। অতএব জড়শক্তির ব্যাপার আপাত"মুগ্ধকারিণী বৈচিত্র মাত্র। ঐ প্রকাণ্ড সর্প-শব্দটী ধরিলে সেকি ফণা বিস্তার করিয়া গর্জ্জন করে? তাই বলিতেছি, নিরাকার মহাশক্তি অনন্তব্যাপিনী, স্থূলের অতীত। পরমাণু নিত্য হইলেও অসীম শক্তিকে আয়ত্ত করিতে পারেনা। এক বিন্দু তৈল সমুদ্রে প্রক্ষেপ করিলে, তাহার পরমাণু সম্যক্‌রূপে বিস্তৃত হইলেও, তাহা কেবল ঐ অকূল জলধির কণামাত্র স্থানই অধিকার করিয়া থাকিতে পারে।"

তান্ত্রিক ঠাকুর আর কিছু বলিলেন না। তাঁহারা উভয়েই তুষ্টিভাব অবলম্বন করিলেন। কিছুকাল পর কমলাকান্ত কৌলবিৎ সাধক

মহোদয়কে আর একটী প্রশ্ন করিলেন যে, "বামাচার মতে মদ্য, মাংস, মৎস্য, মুদ্রা, মৈথুন এই পঞ্চ মকার যোগের সাধন প্রণালীর মর্ম্ম কি? ইহার ভিতরের তত্ত্ব বুঝাইয়া দিলে বড় সুখী হইব।" তান্ত্রিক ঠাকুর আহ্লাদিত হইয়া বলিলেন, "এটি অতি গূঢ় কথা; আপনি কি তান্ত্রিক?" কমলাকান্ত হাসিয়া উত্তর দিলেন, "এক সময়ে ছিলাম বটে!" ইহা শুনিয়া তান্ত্রিক ঠাকুর বলিলেন, "এখন কি?" কমলাকান্ত বিনীত ভাবে উত্তর দিলেন, "একমাত্র চৈতন্যরূপিনী মাতৃ পূজা ভিন্ন আর কোন পূজা বুঝি না। তান্ত্রিক ঠাকুর প্রীতি সহকারে বলিলেন, "ভাল ভাল! তবে ত পঞ্চ মকারেও সেই বিশ্বজননীরই আরাধনা করা হয়। আরও দেখুন, ঐরূপ ভোগসুখের পঞ্চ মকার যোগে একটী বড়ই বীরসাধন রহিয়াছে। ইন্দ্রিয় লালসার প্রতি অনুরাগ রাখিয়াও অনাসক্ত ভাবে পদ্মপত্রের জলের ন্যায় লোভে নিবৃত্তি, কামে নিষ্কাম, বাসনায় বৈরাগ্য এইটি কি বীরসাধন নহে?" কমলাকান্ত তাঁহার ঈদৃশ সাধনবীরত্বের কথায় এই কথা বলিয়াছিলেন যে, "ভোগসুখ ইন্দ্রিয় চরিতার্থে নিষ্কাম ধর্ম্মসাধনের সাহায্য হইতে পারে না। প্রকৃত ভাবে ভাবিয়া দেখিলে, ঐরূপ বীরত্বে এক দিকে নরক অপর দিকে ভ্রূণ হত্যাকারী ঘোর অপরাধী হইতে হয়। কেননা শুক্রস্তম্ভনজনিত শুক্র-কীট বিনষ্ট হইয়া যায়।" আগমসারোক্ত মহানির্ব্বাণতন্ত্রের আধ্যাত্মিক পঞ্চমকার সাধনের কথা তুলিবামাত্র তিনি বলিলেন, "হাঁ ও সকল দেখিয়াছি।"

যাহা হউক, এখানে আমরা পাঠকের দৃষ্টির জন্য মহানির্ব্বাণতন্ত্রের শ্লোক কয়টী উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। তাহাতে আধ্যাত্মিক পঞ্চ মকার যোগের যে মন্ত্র গুলি আছে, তাহা পরিত্যাগ করিলে পার্থিব পঞ্চ মকার সাধন কতদূর সঙ্গত তাহা অনায়াসে বুঝা যায়।

"সোমধারা ক্ষরেদ্ যাতু ব্রহ্মরন্ধ্রাৎ বরাননে।
পীত্বানন্দময়ীং তাং যঃ সএব মদ্য সাধকঃ॥"

যোগীর ব্রহ্মরন্ধ্র হইতে যে অমৃত ক্ষরিত হইয়া থাকে, তাহা পান করিলে পরমানন্দ হয়। উহাই মদ্যপান সাধন সিদ্ধ।

"মাশব্দাদ্রসনা জ্ঞেয়া তদংশান্ রসনা প্রিয়ে।
সদা যো ভক্ষয়ে দ্দেবি সএব মাংস সাধকঃ॥"

"মা রসনা শব্দের নামান্তর বাক্য তদংশভূত," যে যোগী নিয়ত ভোজন করেন তিনি ঐরূপ মাংস ভক্ষণে সিদ্ধ।

"গঙ্গা যমুনয়োর্ম্মধ্যে মৎস্যৌদ্বৌ চরতঃ সদা।
তৌ মৎস্যৌ ভক্ষয়েদ্ যস্তু সভবেন্মৎস্য সাধকঃ॥"

ইহার সার অর্থ ইড়া পিঙ্গলা রূপ গঙ্গা যমুনা মধ্যে শ্বাস ও প্রশ্বাস, ইহারাই মৎস্য। এই মৎস্য ভক্ষণ করিলে মৎস্য ভক্ষণ সিদ্ধ হয়।

"সহস্রারে মহা পদ্মে কর্ণিকা মুদ্রিতা চরেৎ।
আত্মা তত্রৈব দেবেশি কেবলং পারদোপমঃ॥
সূর্য্য কোটি প্রতি কাশং চন্দ্র কোটি সুশীতলম্।
অতীব কমনীয়াঞ্চ মহা কুণ্ডলিনী যুতম্।
যস্য জ্ঞানোদয় স্তত্র মুদ্রা সাধক উচ্যতে॥"

বিস্তৃত রূপে উল্লেখ করা নিস্প্রয়োজন। ষট্ চক্র সাধন ভাব মধ্যে আত্মার স্থিতি। সুতরাং পার্থিব মলিন ভাবের সহিত তুলনা করা যায় না। মূল কথা আত্মার প্রকাশই জ্ঞান-মুদ্রারূপে উক্ত হইয়াছে উহাই মুদ্রা সিদ্ধ।

"মৈথনং পরমং তত্ত্বং সৃষ্টি স্থিত্যন্ত কারণম্।
মৈথনাৎ যায়তে সিদ্ধি ব্রহ্ম জ্ঞানং সুদুর্লভম্॥"

ইহার মূল সত্য পার্থিব মৈথুন ক্রিয়ার উর্দ্ধে। পুরুষ অর্থে নিরাকার নিত্যচৈতন্য। পুরুষশক্তির পূর্ণভাবের প্রকার ভেদে মহাশক্তি রূপা স্ত্রীভাব—এক ব্রহ্মস্বরূপের উভয় ভাবের মহা মিলনই মৈথুন। যোগীর চিত্ত অহমিকামিত্ব বর্জ্জিত হইলে মৈথুন প্রয়াসী হয়। অতঃপর

"মনঃ রম ইতি রাম"। এই নিরাকার তারক ব্রহ্মনামে যোগী ঐরূপ মৈথুনে সিদ্ধ হন। পার্থিব ঘৃণিত মকার সাধনে নহে।

অনন্তর কমলাকান্ত আপনাকে অতি দীন ভাবিয়া বলিলেন "তত্ত্বজ্ঞ! এই মহত্তত্ত্ব সম্বন্ধে কোন কথাই বলিতে পারি না। কারণ, আপনি শাস্ত্র-চক্ষুর উজ্জ্বল দৃষ্টিতে সকলি দেখিতেছেন। বস্তুতঃই মহা শক্তির আরাধনায় মকার পঞ্চ হৃদয় গ্রাহী এবং পরমানন্দময় যোগের সমষ্টি কিন্তু উহা পার্থিব বিকৃত পঞ্চ মকার তত্ত্বের বহির্ভূত, ভোগ সুখের জন্য নহে। স্পষ্টই বলিতে পারা যায় যে, তন্ত্রোক্ত মকার পঞ্চ বীভৎস রসে কলুষিত হইয়া অনিষ্টই সংঘটন করিতেছে। অনেক জ্ঞানী ধ্যানীও প্রকৃত তত্ত্বের বিষয় না বুঝিয়া ঐ বীভৎসরসে ডুবিতেছেন, তথাপি একবার চিন্তা করিয়া দেখেন না যে, উহাদ্বারা জগতের কত অনিষ্ট সংঘটন হইতেছে।"

"আপনি কৌলবিদ্ মহাসাধক; আপনার নিকট এই অল্প জ্ঞানীর ঈদৃশ মহত্তত্ত্বের বিষয় বলিবার কি কোন শক্তি আছে? তবে কৌতুহল প্রিয়তার হস্ত হইতে উদ্ধার হওয়া বড় সহজ নহে, তাই একটী কথা বলিতেছি' মহা নির্ব্বাণ তন্ত্রের ঐ সকল মহামন্ত্রে কি সাধন প্রতীক্ষা করে না? আমার মনে হয়, তাহাতে সাধন-সিদ্ধি বিষয়ে কঠোর তপস্যার প্রয়োজন। এজন্য প্রাণের আবেগে একটী কথা বলিতে ইচ্ছা হইতেছে যে, সাধনের সময়োচিত সহজ উপায় এটি কি হইতে পারেনা যে, মত্ত, মগ্ন, মনন, মধুর ও মহাভাব দ্বারা বিশ্বজননী ব্রহ্মময়ীর পূজা করিতে হইলে, তাঁহার নামে মত্ত, সাধনে মগ্ন, প্রার্থনায় মনন, ধ্যানে মধুর, যোগে মহাভাব হওয়া উচিত। এইরূপ পঞ্চবিধ মকার সাধনে কি সিদ্ধি লাভ হয় না? বোধ হয় এই মকার পঞ্চ প্রপঞ্চ নহে। ইহার আশ্রয়ে ভক্ত, সাধক, যোগী ইহাঁরা কি শান্তি লাভ করিতে পারেন না?"

তান্ত্রিক ঠাকুর আহ্লাদিত হইয়া বলিলেন, "আজ বড় সুখী হইলাম। যাঁহার যে বিশ্বাস থাকুক তৎসম্বন্ধে কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই। যাহা হউক, আপনার হৃদয় উদ্ভূত এই পঞ্চ মকার তত্ত্ব শ্রবণ করিয়া বড়ই প্রীতি সম্ভোগকরিলাম। আপনি আমার একজন পরম আত্মীয়। ধর্ম্ম বিশ্বাস বিভিন্ন সত্ত্বেও আমার প্রাণ আপনার প্রাণে যেন সর্ব্বদা মিলিত থাকিতে চায়।" এই কথাটী বলিয়া তান্ত্রিক ঠাকুর তথা হইতে চলিয়া গেলেন।

**খ্রীষ্টীয়ান বন্ধুর সহিত সদ্ভাব**—ধূলিয়ান বন্দরে কোন সময় জনৈক খ্রীষ্টীয়ান ধর্ম্ম প্রচারক আসিয়াছিলেন। তিনি অতি প্রাঞ্জল ভাষায় যেরূপ বক্তৃতা করেন তাহাতে কমলাকান্ত প্রাণে বড় প্রীতি পাইয়াছিলেন। বক্তৃতার শেষ হইলে খ্রীষ্টীয়ান মিস্‌নরী মহোদয় কমলাকান্তকে নিকটে ডাকিয়া বড়ই আপ্যায়িত করিলেন এবং প্রীতি সহকারে বলিলেন, "আপনার ধর্ম্ম স্পৃহা অতি অনুরাগের সহিত জড়িত, ইহাতে বড় সুখী হইলাম। আপনি প্রভু যীশুর আশ্রয় গ্রহণ কেন করুন না? এইত শুনিলেন তাঁহার ঐশী শক্তির কথা! কমলাকান্ত বলিলেন, "আর মনুষ্যের দাস কেন হইব? দাস হইলে, হিন্দুদের মধ্যেও ত ঐরূপ পরিত্রাতা ও দেবশক্তি বিশিষ্ট অনেক আছেন, তঁহাদের দাস কেন হইনা? এক জনের দাস হইব কেন? যদুকুল তিলক কৃষ্ণ বাম হস্তের কনিষ্ঠাঙ্গুলিতে গোবর্দ্ধন পর্ব্বত ধারণ করিয়াছিলেন। রঘুকুল ধুরন্ধর রামচন্দ্র অবলীলাক্রমে জলে পাষাণ ভাসাইয়া ছিলেন। অনেকেই সাধন বীরত্ব বলে শূন্যে অবস্থিতি করিয়াছেন। ভারতে এইরূপ শক্তি সম্পন্ন পরিত্রাতার অভাব দেখা যায় না। ইহাঁদিগকে ছাড়িয়া একমাত্র খ্রীষ্টকে ধরিব কেন?" খ্রীষ্টীয়ান বন্ধু হাসিয়া বলিলেন, "পরের হিত কামনায় জীবন উৎসর্গ করিতে পারেন, প্রভু খ্রীষ্টের মত এমন আর কে আছেন, তাঁহাকে যখন ঘাতকেরা বধ করে, তখনও তিনি তাহাদের জন্য মঙ্গল

প্রার্থনা করেন।" কমলাকান্ত অশ্রুপূর্ণ লোচনে তাঁহার মুখপানে চাহিয়া এই কথাটী বলিয়াছিলেন। "প্রেমের বিধানে মহর্ষি যীশুর নিকটে জগৎ চির ঋণী, কিন্তু তাঁহাকে পরিত্রাতা কিরূপে বলা যায়। এক চিন্ময় অনন্ত পুরুষ ব্যতীত আর কাহাকে পূজা করিব।" খ্রীষ্টীয়ান বন্ধু যে কয় দিন ধুলিয়ানে থাকিলেন, কমলাকান্ত অন্ততঃ একবার যে কোন সময়ই হউক তাঁহার নিকট যাইতেন। ধর্ম্মালোচনায় পরস্পরে বড়ই সদ্ভাব জন্মিয়াছিল।

মৌলবীর সঙ্গে প্রেম—পশ্চিম প্রদেশ হইতে ধুলিয়ান বন্দরে এক জন মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী মৌলবী আইসেন। ইনি পূর্ণ যৌবন-সম্পন্ন অতি ধীর-গম্ভীর অথচ ইহাঁর মুখখানি সতত আনন্দযুক্ত। হৃদয়ে ধর্ম্ম বিশ্বাস জলন্ত, কথাগুলি মৃদু মৃদু কিন্তু তাহার ভাব অতি ওজস্বী। তিনি মুসলমান সন্তানগণকে আরবী ভাষায় জ্ঞান শিক্ষা এবং সাধন-হীন মুসলমানদিগকে কোরানের সার তত্ত্ব উপদেশ দিয়া মোহ অন্ধকার দূরীভূত করিবার জন্য সতত ব্যাকুল হন! কিছুদিন পর একটী পতিতার কন্যাকে বিবাহ করিয়া ঐ কুলটা রমণীকে পাপ-পথ হইতে সৎপথে আনেন। কমলাকান্ত তাঁহার এই উদার ভাব ও সরলতার কথা শুনিয়া তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য বড় ব্যস্ত হন। হঠাৎ একদিন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইল। কমলাকান্তের পরিচ্ছদ দেখিয়া মৌলবী সাহেব তাঁহাদের রীত্যনুসারে কর মর্দ্দন দ্বারা যথেষ্ট সম্মান করিলেন। বলিলেন, "আমি অনেক দিন হইতে আপনার বিষয় অবগত আছি। আজ খোদার ইচ্ছায় 'মোলাকাৎ' হওয়াতে বড় 'খোষ' হইলাম।" অনেক ধর্ম্মালোচনার পর উভয়ের ধর্ম্মমত এক হইয়া গেল। তাঁহারা ধর্ম্ম মিলনে বড় আনন্দ সম্ভোগ করিলেন। কিন্তু দুই একটা কথায় পরস্পর একটু গোল বাধিল।

মৌলবী বলিলেন, "আপনারা খোল-করতালের 'খচ্‌খচিতে'

ধর্ম্ম সাধন করেন কেন? ওটাকি বাহ্য আড়ম্বর নহে? কমলাকান্ত উত্তর দিলেন, হজরত মহম্মদ একমুখা বাদ্যযন্ত্র বাজাইতেও বলিয়াছেন! মৌলবী বলিলেন, সে কখন?—যুদ্ধের সময়। আপনাদের কি তবে ওটা যুদ্ধের ব্যাপার? কমলাকান্ত বলিলেন, ইহা অপেক্ষা আপনাদের মধ্যেই মারাত্মক ভাব আছে!

মৌলবী বিস্মিত হইয়া বলিলেন, সেকি! ইসলাম ধর্ম্মে ত "লা এলাহা ইল্লা ল্লাহ" অর্থাৎ 'এক মেবা দ্বিতীয়ম্' ছাঁকা একেশ্বরবাদ ধর্ম্ম। কমলাকান্ত অতি বিনীত ভাবে উত্তর দিলেন, "দেখুন! মক্কা নগরে এব্রাহিমের বংশধর কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত প্রাচীন কীর্ত্তি কাবা মস্‌জিদ আছে, উহার চতুর্দ্দিকস্থ দেশবাসী মুসলমানগণ ঐ মস্‌জিদকে সম্মুখে রাখিয়া নমাজ করেন। মস্‌জিদটী যেন খোদার বাসগৃহ। খোদা ঊর্দ্ধে অধঃতে বামে দক্ষিণে পশ্চাতে সম্মুখে বাহিরে ভিতরে ওতপ্রোত-ভাবে আছেন, এটি কি আপনি বিশ্বাস করেন না?—ভাবিয়া দেখুন ত, আপনাদের এই নিয়মে কি খোদাকে সীমায় আনিয়া একটী ক্ষুদ্র স্থানে ক্ষুদ্র করা হইতেছে না? উহাই যে মারাত্মক কথা! তবেই বলিতে হয়, ইহা অপেক্ষা খোল করতালের 'খচ্‌খচি' বড় গুরুতর নহে।" মৌলবী সাহেব হাসিতে হাসিতে কমলাকান্তের আবার কর মর্দ্দন করিয়া বলিলেন, "আপনি অবকাশমত দেখা দিবেন।" সেই অবধি তাঁহার সহিত কমলাকান্তের বড় প্রেম জন্মিল। যখনই দেখা হইত তখনই যেন পরস্পর আপনার একজন আত্মীয় মনে করিয়া গভীরতত্ত্বের আলোচনা করিতেন।

---

# একাদশ পরিচ্ছেদ।

কমলাকান্তের অনেক দিন হইতে পর্ব্বত দেখিবার বড় বাসনা ছিল। কোন সময় মুর্শিদাবাদ হইতে রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ডাক্তার মহোদয় কাঞ্চনতলায় আইসেন। তাঁহার সঙ্গে কমলাকান্ত পাকুড় রাজাধিকার মধ্যে "ধরণী" নামক পর্ব্বতে উপস্থিত হন। সেই পর্ব্বতের পাদতলে সমতল ক্ষেত্রে একটী অপূর্ব্ব ঝরণা ছিল। তাঁহারা ঐ সুশীতল নির্ম্মল জলে স্নান করিয়া বড় তৃপ্তি পাইলেন। তাঁহারা পর্ব্বতে উঠিবেন এমন সময়ে একটী দ্বাদশ বর্ষীয় বালক একটী মাটীর কলস লইয়া সেই স্থানে উপস্থিত হয়। কমলাকান্ত তাহাকে বলিলেন, "বাপু! ঐ কলসটী এক রাত্রির জন্য দিতে পার কি? বালকটী তখনই ঝরণা হইতে জল লইয়া তাঁহাদের অগ্রে অগ্রে চলিল। "ধরণী" নিতান্ত ক্ষুদ্র নহে, তাহার মধ্য প্রদেশে আসিয়া একবার বিশ্রামও করিতে হয়। পর্ব্বত-শৃঙ্গের নিম্নভাগে অল্পমাত্র সমতল ক্ষেত্রে একটী আম্র বৃক্ষ। সেই বৃক্ষতলে কম্বল পাতিয়া উভয়েই শ্রান্তি দূর করিতে লাগিলেন। কমলাকান্ত আসিবার পূর্ব্বে মৃণ্ময় কমণ্ডলুতে সেই কজ্জল-নিভ-নিন্দিত ঝরণার জল কিছু লইয়া আইসেন। পিপাসায় উভয়েই কাতর—ঐ সময় দুইটী অতি ক্ষুদ্র আম্র ফল পতিত হইল। ঐ কষায় ক্ষুদ্র ফল দুইটী দুইজনে এক একটী লইয়া চর্ব্বন করিতে লাগিলেন এবং কমণ্ডলুস্থ জল পান করিয়া যারপর নাই তৃপ্তিলাভ করিলেন।

রামচন্দ্র বাবু কমলাকান্তকে খুড়া বলিতেন। প্রাণের গভীর আনন্দে বিহ্বল হইয়া বলিলেন, "খুড়! এ সময় একটী গান করুন না!" কমলাকান্ত হাসিয়া বলিলেন, "আমার শিঙা-নিনাদ-নিন্দিত কণ্ঠের সঙ্গীত শ্রবণেরও ইচ্ছা?—যাহা হউক, ভাইপোর আনন্দ বর্দ্ধন করা

কর্ত্তব্য” এই বলিয়া তিনি “সত্যমঙ্গল প্রেমময় তুমি”—এই গানটী গাহিলেন। কি আশ্চর্য্য! ভাঙ্গা গলায় তাহাতেই যেন প্রেমের প্রস্রবণ বহিয়াছিল।

অপরাহ্ন সময়ে তাঁহারা উভয়েই পর্ব্বত-শৃঙ্গ প্রদেশে উঠিলেন। সেই স্থানটী কণ্টকময় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃক্ষে আবৃত সুতরাং বহুকষ্টে দাঁড়াইয়াও যথেষ্ট আনন্দলাভ করিলেন। অত্যুচ্চ শৃঙ্গোপরি কুসুম-পরিমল সম্পৃক্ত মন্দ মন্দ স্নিগ্ধ সমীরণ সেবনে, দিগন্তব্যাপী প্রান্তরের বিবিধ বিচিত্রতা দর্শনে, পার্শ্ববর্ত্তী বিহঙ্গকুলের বীণাঝঙ্কার সদৃশী কণ্ঠগীতি শ্রবণে পুলকিত হইয়া অনেকক্ষণ একই ভাবে ছিলেন। কিছুকাল পর সেই নির্দ্দিষ্ট আশ্রম-বৃক্ষতলে উপনীত হইয়া নানাবিধ সদালাপ করিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে দিবাকর অস্তমিত হইল, তাঁহারা সান্ধ্যোপসনা আরম্ভ করিলেন। অনেকক্ষণ শান্তিসুখ সম্ভোগ করিয়া বড় সুখী হইলেন। রজনী সমাগমে ‘ধরণী’ যেন ধরণীর বক্ষোস্থিত জনপদকে প্রশান্ততা উপহার দিবার জন্ত গভীর ভাবের আবির্ভাবে কি যে অপূর্ব্বভাব প্রদর্শন করিয়াছিল, তাহা ব্যক্ত করা যায় না। খুড়া ভাইপো উভয়েই অনশন রহিয়াছেন, তৎপ্রতি ভ্রূক্ষেপ নাই। রামচন্দ্র বাবু বলিলেন, “খুড়! আমি ত আর বসিতে পারি না।” এই বলিয়া শুইয়া পড়িলেন। কমলাকান্ত শৈল-সৌন্দর্য্য সন্দর্শনে মগ্ন ছিলেন, এমন সময় দুইটী লোক সেই স্থানে উপস্থিত হইল তাহাদের মধ্যে একটীর মস্তকে একটী হাঁড়ি ছিল, সে ব্যক্তি বলিল, “তোরা পাহাড়ে এসেছিস,” এই বলিয়া হাঁড়িটী সম্মুখে রাখিল।

কমলাকান্ত হাঁড়িটী দেখিয়া অবাক্ হইলেন। তাহাতে আতপ চাউল, ঘৃত, লবণ, তেঁতুল ও কয়েকটী পাহাড়ে কচু রহিয়াছে। খুড়া ভাইপোয়ের আনন্দের সীমা নাই। রামচন্দ্র বাবু উঠিয়া বসিলেন ঐ লোক দুইটী তিন খণ্ড ক্ষুদ্র প্রস্তরে উনান প্রস্তুত করিয়া দিল।

কমলাকান্ত দেয়াশলাই জ্বালিয়া প্রস্তর নির্ম্মিত উনানটি জ্বালিলেন। ঐ হাঁড়িটীতে যতগুলি চাউল ছিল সমস্তই উনানে চাপাইয়া দিলেন। জল পূর্ব্বেই আসিয়াছিল। চাউল কিছু বেশী হওয়াতে হাঁড়িতে অন্ন ধরে না, নানা কৌশলে চাউলগুলি কতকটা সিদ্ধ হইলে দুইখানা শালপাতায় অন্ন পরিবেশন করা হইল। সেই তেঁতুল ঘৃত কচুতে যে কি মধুর রস উৎপাদন করিয়াছিল ঐ কথা শুনিলেও প্রেমাশ্রু সম্বরণ করা যায় না। তাঁহারা ঈশ্বরের দয়াকে ধন্যবাদ দিয়া দেবপ্রেরিত প্রসাদ ভক্ষণ করিয়া কৃতার্থ হইলেন। লোক দুইটি যেন প্রভুপ্রদত্ত দয়ারভার ঐ স্থানে রাখিয়া গেল।

তমোময়ী রজনী দিকপ্রসারিণী বক্ষে আদরের বস্তু পর্ব্বতটীকে যেন লুকাইয়া রাখিল। রামচন্দ্র বাবু বড় ক্লান্ত হইয়াছিলেন আর অধিকক্ষণ বসিতে পারিলেন না, নিদ্রায় অভিভূত হইলেন। কমলাকান্ত পর্ব্বতের গম্ভীরভাবে মুগ্ধ হইয়া ব্রহ্মোপসনায় মগ্ন রহিলেন। প্রভাত হইলে চতুর্দ্দিক হইতে বিহঙ্গগণ মধুর ঝঙ্কার দিয়া উঠিল, পূর্ব্ব দিকের রক্তালোকে ধরণীকে রঞ্জিত করিল। রামচন্দ্র বাবুর নিদ্রা ভঙ্গ হইলে উভয়েই প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া গমনোচিত ব্যবস্থা করিতেছেন, এমন সময়ে কৃষ্ণবর্ণ দীর্ঘকায় এক ব্যক্তি একটা চোঙা হস্তে সম্মুখে আসিয়া বলিল, "তোরা কাল পাহাড়ে বড় কষ্ট পেয়েছিস্—একটু দুধ খাবি?" কমলাকান্ত আনন্দে বিহ্বল হইয়া রামচন্দ্র বাবুকে বলিলেন, আর তবে বিলম্ব কেন? উভয়ে দেব-প্রদত্ত দুগ্ধ পান করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

পর্ব্বতের পাদতলস্থ সমতল ক্ষেত্রের অনতিদূরে আসিয়া তাঁহারা একটা ক্ষুদ্র গ্রামে উপস্থিত হইলেন। গ্রামবাসিগণ আনন্দের সহিত তাঁহাদিগকে বড় আপ্যায়িত করিল। একজন মাঝি বলিল, "তোরা কা'ল পথ ভুলিয়াছিলি—আজ আমি ভাল পথে তোদেরকে রেখে

আস্‌ব।” তখনই সে কম্বলটী লইয়া অগ্রে অগ্রে চলিল। তৎপশ্চাৎ খুড়া ভাইপো চলিলেন। পাকুড় রাজধানীর নিকটে আসিলে মাঝি বলিল, “আর ত আমি যাব না! তোরা এই সয়াণে বরাবর চ’লে যা।” রামচন্দ্র বাবু মাঝিটীর সহৃদয়তা দর্শনে বিমুগ্ধ হইয়া বলিলেন, “মাঝি! তুমি বড় উপকার করিলে, আমাদের সঙ্গে কিছুটা পথ চল, তোমাকে আট গণ্ডা পয়সা দিব। তোমার ছেলে মেয়েকে কিছু খাবার কিনে দিও।” মাঝি হাসিয়া ব্যাকুল—উত্তর করিল “তুই ঐ কথাটী বলিস্‌না, আমার ছেলে মেয়ে কি তোদের কিছু কাজ করেছে যে পয়সা দিবি?” কিছুকাল মৌনভাবে থাকিয়া এই কথাটী মাত্র বলিল, “বেলাটা কিছু বটে—দুটী পয়সা দিতে পারিস্।” কিন্তু অবশেষে তাও লইল না।

কমলাকান্ত তাহার এই দেব-ভাব দেখিয়া মাঝির পদধূলি মস্তকে ধারণ করিলেন। রামচন্দ্র বাবু প্রেমাশ্রু সম্বরণ করিতে পারিলেন না। তাহার চরণে হস্ত প্রদান করিতে উদ্যত হওয়াতে—মাঝি, করিস্ কি. করিস্ কি” এই কথাটীতে যেন দেবভাব শিক্ষা দিয়া দ্রুতবেগে প্রস্থান করিল। কমলাকান্ত রামচন্দ্র বাবুকে বলিলেন, “দেখুন! নিস্বার্থ দেব-ভাবের আবির্ভাব নিরক্ষর ব্যক্তির জীবনেও কেমন সুন্দর দেখিলেন? কিন্তু বহু শাস্ত্রদর্শী অভিমানী পণ্ডিতের জীবনে ঐ দেব-ভাবের প্রকাশ কি কখনও দেখিতে পান? হাঁ! আমি ত অতি অধম! ঐ মাঝির কাছে আমার শিখিবার বিষয় যথেষ্ট আছে, এইরূপ অনেক কথা-বার্ত্তার পর তাঁহারা নিজ নিজ স্থানে চলিয়া গেলেন।

পাঠক! পর্ব্বতবাসী অসভ্য জাতির দেব-ভাবের কথা শুনিলেন। এখন সভ্য জগতের শ্রেষ্ঠজাতির মধ্যে একটী দৃষ্টান্ত শ্রবণ করুন। ধুলিয়ানের ব্রাহ্মসমাজের ঘরখানি প্রবল ঝটিকায় পড়িয়া যায় ঐ সুযোগে কোনও সুসভ্য সম্ভ্রান্তব্যক্তি কর্ত্তৃক ব্রাহ্মসমাজ-গৃহটী আর প্রতিষ্ঠিত হইল না। কমলাকান্ত বড়ই মর্ম্মবেদনা পাইয়া আপন আশ্রমটীতে

"কাঞ্চনতলা-প্রচারক্ষেত্র" নাম দিয়া নিজের দ্বারা ধর্ম্ম প্রচার যতদূর সম্ভব তাহাই করেন। মাঝে মাঝে স্থানবিশেষে ভ্রমণেও বাহির হন, কিন্তু বার্দ্ধক্য বশতঃ রীতিমত পরিশ্রম করিতে পারেন না, নানা কারণে সর্ব্বদা দুঃখিত থাকেন।

১৩০৫ সালের আষাঢ় মাসে একদিন ডাকে একখানি পত্র আসিল। কমলাকান্ত পত্রখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া বড় আনন্দিত হইলেন। ঢাকা জেলার অধীন কাওরাদি জমিদারী কাছারী হইতে শ্রদ্ধেয় কালীনারায়ণ গুপ্ত মহোদয় সেই পত্রখানি লেখেন। কমলাকান্তের সহিত যদিও তাঁহার আলাপ নাই তথাপি চিরবন্ধুত্ব ভাবের পত্রখানিতে তিনি তাঁহাকে বন্ধু-বিচ্ছেদ যাতনা হইতে অনেকটা নিবৃত্ত করিলেন। পত্রদ্বারা বন্ধুত্ব স্থাপন যে কিরূপ হয়, তাহা আমরা এখানে অপ্রাসঙ্গিক মনে না করিয়া চারিখানি পত্রের সারাংশ উদ্ধৃত করিলাম। ধর্ম্ম-জীবনের কি যে পরস্পর আকর্ষণ তাহা গুপ্ত মহোদয়ের পত্রে বেশ জানা যায়। তাঁহার লিখিত ঐ চারিখানি পত্র এই জীবনীতে সন্নিবেশিত করা হইল, কেননা ঈদৃশ ধর্ম্মবীর ও সমৃদ্ধিশালী জমীদারের প্রাণে অবিচ্ছন্ন প্রেমের তরঙ্গ কিরূপ, শুনিলেও হৃদয় আনন্দে পূর্ণ হয়।

[ প্রথম পত্র ]

ঢাকা জেলা, কাওরাদী কাছারী<br>
পোঃ কাওরাদী ১৩০৫ সাল<br>
৯ই আষাঢ়।

"সবিনয় নিবেদন এই—

মহাত্মন্! যদিও আপনার সঙ্গে চাক্ষস নাই, না থাকিলেও অপরিচিতের ভাবে, নব্যভারতে "উপাসনার ভাষাতত্ত্ব" প্রবন্ধ পাঠ করিয়া সত্যসত্যই আপনার সঙ্গে প্রাণের আপ্যায়িত ও সমবিশ্বাসী ধর্ম্মবন্ধুতা স্থাপিত হইল, এবং 'সঞ্জীবনী'তে আপনার তত্ত্বোপনিষদের সমালোচনা যে দেখিয়া ছিলাম তাহা পাঠ করিতে ইচ্ছা প্রবল হইল। আশা এই

তৎপাঠে প্রাণের টান আর বৃদ্ধি পাইবে আর মিলিবে, ইহাতে হয়ত আপনার ব্রহ্মানন্দ পূর্ণ কায়া দর্শন পর্শন করিয়া চরিতার্থ হইব, প্রাণের কথা সকল বলিয়া শুনিয়া মুগ্ধ হইব। ফলে ব্রাহ্মসমাজে আসিয়াছি অবধি যে সকল মত ভাব পোষণ করি আপনার প্রবন্ধে প্রায় তাহা একীভূত। গ্রন্থখানা দেখিলে যে আর কি হইবে দাতা জানেন। নিবেদন শীঘ্র ভেলুপেবল ডাকে একখান তত্ত্বোপনিষদ্ গ্রন্থ পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। উপরে যে ঠিকানা লেখা হইয়াছে সেই মতে পাঠাইলেই পাইব ইতি।"

বিনীত নিবেদন
শ্রীকালীনারায়ণ গুপ্ত।

[ দ্বিতীয় পত্র ] ১৩০৫। ১লা শ্রাবণ।

"মহাত্মন! আপনার প্রেমের উপহার আমার প্রাণের স্পৃহারধন, প্রাণ ভরিয়া গ্রহণ করিলাম এখন পান করিতে থাকিব। উদার দাতা কি দিবেন? এই ভাবে পুস্তকখানি ধীরে ধীরে পড়িতে গিয়া তাহার বিশেষ আস্বাদন ভুগিতে ভুগিতে সম্মুখে যাঁহারা থাকেন, তাঁহাদের সঙ্গে ভালবাসায় মনে যাচাই করিয়া করিয়া সকলে মিলে ভাল বাসিতে যাই তাই সমগ্র পড়া হয় নাই, পড়ার আগে বলার নাই।

আত্ম পরিচয়ের জন্য আমাদের ভাব সঙ্গীত একখানা বুকপোষ্টে পাঠাই। রাগিণীর জন্য অপেক্ষা না করিয়া শুধু আগা গোঁড়া বই থানি পাঠ করিয়া দেখিবেন, এই দৃঢ় বিশ্বাস আছে বলিয়া আমি পত্র খানি যেমন খিচিমিচি পুস্তক খানিও এইরূপ আপনে দেখিবেন বলিয়া শুদ্ধ করিতে গিয়া কাট কুট করিয়াছি, কিন্তু ইহাতে আমার কষ্ট হয় নাই কারণ পুস্তকে দেখিবেন মুদ্রাঙ্কন অন্য হস্তে হইয়াছে, অবশ্য তিনি যতদূর করিয়াছেন তাহার তুলনায় অজ্ঞাতসারে যাহা ভুল তাহা আমার স্মরণ করাও অনুচিত। তথাচ সেই ক্ষমনীয় ভুল থাকিলেও আপনার

ন্যায় লোকের নিকট তাহা ঠিক করিয়া না দিলে মনে বুঝে না, অথচ অন্য কর্ত্তৃক সংশোধিত হইলেও মন শুদ্ধ হয় না তাই এই দশা, বন্ধু ভাবে গ্রহণ করিবেন। এ সকল অবস্থার পরে "উপহার" বলিয়া উল্লেখ করা যাইতে পারে না কিন্তু ইহা তাহাই বটে।

এখানে একটী ক্ষুদ্র ব্রাহ্ম সমাজ আছে তাহার নাম 'কাওরাদি ব্রাহ্ম সমাজ' সাহা, লগ্নাচার্য্য, রুদ্রপাল শ্রেনীর স্থানীয় কয়েকটী আনুষ্ঠানিক পরিবার এবং ব্যক্তিগত বিবাহিত ও অবিবাহিতভাবে ২।৩টি পুরুষ আছে। সর্ব্বশুদ্ধ ২৫।২৬ জন লোক হইবে। কাওরাদি হইতে ৩।৪ মাইল দূরে দূরে বাড়ী, একস্থানে প্রায় তিন পরিবার আছে। পূর্ব্বে কাওরাদি ব্রহ্ম মন্দির যে গৃহে ছিল, তথায় আমার স্ত্রী অন্নদা গুপ্তা কর্ত্তৃক ১৩০৩ সালের চৈত্র মাসের ২০ শে তারিখে একখানি ইষ্টক নির্ম্মিত পাকা মন্দির প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে সেই গৃহখান লেংটীপাড়া গ্রাম নামক স্থানে উঠিয়াছে, অনেকে সপরিবারে সেখানে সামাজিক ও প্রাত্যহিক উপাসনা করে। আমাদের মন্দিরে বা সমাজে বসিয়া কোন দেব দেবীর নামে বা মাতা পিতাদি পার্থিব পরিমিত সম্বন্ধে সম্বোধন করি না। খোল করতাল ঢাক ঢোল আদি গোলমেলে যন্ত্র বা শঙ্খ ঘণ্টা উপাসনা বা কীর্ত্তনে ব্যবহার করি না, সুর ঠিক রাখার জন্য এক তানপুর, আর করের করতাল বা তুড়ী। সময়ে তানপুর সঙ্গে যে সকল যন্ত্রের যোগ মিলিতে পারে যথা বেহালা এছরাজ, ঢোলক তবলা পাখওয়াজ, বাজিলেও দোষ মনে করি না, কিন্তু অনেক যন্ত্রে গান খারাপ হয়, কারণ অন্যে গান স্পষ্ট বুঝিতে পারে না, ইহাও গোলমাল অতএব ২।১টী সাহায্যের জন্যই দৈবাৎ কোন সময় রাখিয়া থাকি।

ঈশ্বরের মহা অস্তিত্ব আমাদের সম্পত্তি, ওঁব্রহ্ম আমাদের ধ্বনি, নাম স্মরণ, কীর্ত্তন। প্রায় প্রতি বৎসরই আমরা মাঘোৎসবের অব্যবহিত পর প্রচারার্থে ও গ্রহণার্থে বিদেশে বাহির হই, তাহাতেই রাস্তায় ও কোন

নির্দ্দিষ্ট স্থানে সঙ্গীত বা কীর্ত্তনাদি ও কথাবার্ত্তা উপাসনা করি, এইরূপ সাদা ভাবে হইয়া থাকে। আমরা অভাবের গান গাই না, ভাবের গানই খুব গাই, আমাদের ইচ্ছা ঈশ্বরেতে পূর্ণ হয়, সংসার ও ধর্ম্ম ইহার ছোট ও বড় এই দুই মানিয়া, এই ব্রহ্ম যোগে সাক্ষাৎকার জানিয়া এক ব্রহ্ম দ্বিতীয় নাস্তি আমাদের সাধন হয় ইতি।"

নিবেদক শ্রীকালীনারায়ণ গুপ্ত।

[ তৃতীয় পত্র ] ১৩০৫। ৯ই শ্রাবণ।

"সবিনয় নিবেদন—

মহাত্মন! বোধ হয় আমার পত্র ও ভাব সঙ্গীত পাইয়াছেন, সেই সঙ্গে এবার প্রচার জন্য দুইটী নূতন গান ও পুরাতন ২।৩টী গান লইয়া যে একখানা চটি বই ভাব সঙ্গীত হইয়াছিল তাহা দেই নাই। অতএব এই বই ২ খানা বুকপোষ্টে পাঠাইলাম গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ করিবেন।

এই পুস্তকের ২য় সঙ্গীতটী স্বরূপ সম্বন্ধে ও ভূকম্পের শেষ গানটী নূতন হইয়াছে, অন্য গান বড় পুস্তকে আছে কোন স্থানে পরিবর্ত্তিত বা বর্দ্ধিত হইয়া থাকার বিষয়, তাহা দেখিয়া দেই নাই।

এইরূপ প্রায় প্রতি বর্ষেই নূতন ২।৪টী গান সহ পূর্ব্বগান সঙ্গে দিয়া এইরূপ চটি বই মাঘোৎসবের সময় বাহির হয়, কোন পুস্তকই বিক্রী করা হয় না। ২।৪ বৎসর পরপর সাবেক গান ও এই সকল নূতন গান সহ বড় করিয়া পুস্তকাকারে ভাব সঙ্গীত বাহির হইয়া থাকে।

আপনার উপহার 'উপনিষদ্' দুইবার পড়িয়াছি অনেক স্থানে এক মহা সংশয় হইয়াছে আবার পড়িতে পড়িতে তাহা দূর হইয়াছে, ফল কথা পুস্তকের সকল বিষয়ই আমার মৌলিক সংস্কার মূলক। তবে ২।১ স্থানে একবারে মতের সমান সমান না হইতেও পারে এবং না হওয়াই স্বভাবিক মনুষ্যত্ব। আর একটা বিষয় বড় প্রাণের জিনিষ

পাইয়াছি। এমন সকল সত্য পুস্তকের মধ্যদিয়া বহিতেছে যাহা সর্ব্ব সময় বিশ্বাসের উপযোগী হইয়া বর্ত্তমানে বুঝিতে বা বুঝাইতে পুরাতন দৃষ্টান্তকে গ্রহণ করে? অতএব আপনার কথাতে যে এই মহা সৌন্দর্য্য নিগূঢ় ভাবে বর্ত্তমান রহিয়াছে, এই দেখিয়াই আরও ঢলিয়া পড়িয়াছি। এই সত্য না থাকিলে মৃত ভাব মৃত বিষয়, দিনে দিনে সত্য হতে অসত্যে, জ্যোতি হতে অন্ধকারে, অমৃত হতে মৃত্যুতে যাইতে হয়, কিন্তু ব্রহ্ম কৃপা এমনই যে সহস্র বৎসরের অন্ধকার গুহা মধ্যে মশাল লইয়া উপস্থিত হইবা মাত্রই তৎক্ষণাৎ সমস্তই আলোকিত হয়। এরূপ ব্রহ্মকৃপা অজ্ঞানতা হতে আমাদিগকে অবশ্য বিজ্ঞ করেন। সেই কৃপাতেই কত মূর্খ পণ্ডিত হইল, কত মৃতে জীবন সঞ্চার হইল, কত অসাধ্য সাধন হইল, হইতেছে ও অনন্তকাল হইবে।

ব্রহ্মজ্ঞান যদি মানুষকে জীবন্ত মানুষ না করিল, তবে আর ব্রাহ্মধর্ম্মে মাহাত্ম্য ও রস কি বুঝিলাম? যদি কেবল সেই পুরানা বন্দনাই বন্দনা করিলাম, আর জাতি মানিলাম না, এই মতে আকৃষ্ট হইয়া ব্রাহ্ম ধর্ম্ম যে লয় সে শীঘ্রই ছাড়িয়া দেয়। ভাই আশীর্ব্বাদ কর ব্রহ্মজ্ঞান প্রসাদে জীবগণ ব্রাহ্মধর্ম্ম পাইয়া জীবন্ত জীবন লাভ করুক, প্রাণের কামনা পূর্ণ হোক, অনেক দিন মেঘ থাকিয়া রৌদ্র উঠিলে যেমন সকলের ঘরের ধান্য ইত্যাদি শুকাইয়া লয়, এখন অনেক দিন পর প্রাণে ব্রহ্মালোক পাইয়া নর নারী সাধন বলেই ভিজা জীবনকে, বিশুদ্ধ করিয়া ব্রহ্মদাস ব্রহ্মদাসীতে মিলে ব্রহ্ম-রাজ্য স্থাপন পূর্ব্বক তোমার যোগ আমার যোগ এই যোগে জগতের যোগ এক হোক, আর কি।"

ওঁব্রহ্ম ওঁব্রহ্ম ওঁব্রহ্ম

নিবেদক শ্রীকালীনারায়ণ গুপ্ত।

[ চতুর্থ পত্র। ] ১লা ভাদ্র ১৩০৫ সাল।

"প্রাণের ভাই ব্রহ্মদাস! ২ খান ভাব-সঙ্গীত ও পত্র দিলাম কেন যে প্রাপ্তি সংবাদ পাইতেছি না তাই মনে নানা কথা উঠে পড়ে, সত্য কি জানিতে চাই। একবার মনে হয় ভদ্রতা বিরূদ্ধ মত কাট-কুট করা পুস্তক দেওয়াতে আমার কোন ক্রুটী ধরিয়া বা উত্তর দানে স্তম্ভিত হইয়া আছেন। আবার ভাবি ঠিক কথা বুঝিবার জন্য যাহা করিলাম তাহাতে মনে লাগিবে কেন? অবশেষে ভাবি একদিকে যখন আপনি রহিয়াছেন তখন এসব সন্দেহ আমার আত্মবিকার বলিয়া শান্ত হই। আপনার উপনিষদ্ যত বার পড়ি ততই অনুরাগী হই, ফুরায় না ফুরাইতে চায় না। এই উপনিষদ্ যে আমার কি মহৌষধ হইয়াছে, তাহা জানি না। ভগবানের উদার দান মধ্যে আপনার উপনিষদ্ শুদ্ধ আমার একটী চির স্মরনীয় মহাদান। আপনাকে যত পাই আরও পাইব, আপনি আমার অনন্ত কাল পাইবার ধন। অনন্ত মহামিলনে যে আর কত মিলিব, আর কত পাইব, অনন্ত বিনা তদন্ত কে জানে? কিন্তু প্রাণে আশার ধারা বহে, তাহাতেই ঐ চির শান্তি বিরাজমান। মায়ের স্তন্য যেমন আস্তে ২ আসিয়া মুখ ভরে পেট ভরে ও স্নিগ্ধ করে, এই আশা পূরণের জন্য আজ আপনি আসিতেছেন, কল্য অন্য আসিবেন, সুখ হইতে সুখ, লাভ হইতে লাভ পাইয়া পরিতৃপ্ত হইতেছি। একসঙ্গে কথা বার্ত্তা বলিতে বলিতে পথ চলিয়া যাওয়া কেমন সুখের ব্যাপার, আমরা এরূপ হাত ধরা ধরি করে চলেছি। ভাই! যদি হাত ধরেছ ছেড় না। তুমি বড় সুন্দর কথা কও, তাই বলি বল, শুনিয়া শুনিয়া চলিতে থাকি। জয় ব্রহ্ম জয়।

তার পর দেখা শুনা হইবার বিষয় কি হইতে পারে? দেখার জন্ত প্রাণে বড় টান পড়িয়াছে আর না দেখিয়া যেন পারি না, যখন আপনি তত্ত্ববিৎ তখন অবশ্য বুঝিবার ক্ষমতা আছে। সময় বুঝিয়া জানাইলে

পাথেয় পাঠাইতে পারি অথবা এখানে আসিলে দিতে পারি। কিন্তু সময়টী পূর্ব্বে জানা আবশ্যক কারণ আমার কাওরাদি থাকা চাই। নারায়ণগঞ্জ হইতে দশটা রাত্রে যে ট্রেন নসিরাবাদ যায় সেই ট্রেণ কাওরাদি পৌঁছে। সেই ট্রেণে রাত্রি প্রায় ৩ টার সময় এখানে আসা যায়। আর গোয়ালন্দের মেল ষ্টীমারে আসিলে সম্ভবতঃ দুই হইতে তিনটার মধ্যে নারায়ণ গঞ্জ আসিয়া ৪টার পর ঢাকা পর্য্যন্ত একখানা ট্রেণ আসে। ছয়টার সময় ঢাকা হইতে রওনা হইয়া দশটার সময় কাওরাদি পর্য্যন্ত একখান লোকাল ট্রেণ আইসে, তাহাতে এখানে আসিলে রাত্রে আহার এক প্রকার সময় মত করা যায়, আশা করি এই ট্রেণে আসিবেন নিবেদন ইতি।”

ইহাতে স্পষ্টই বলিতে পারা যায়, পার্থিব সম্বন্ধ অপেক্ষা আধ্যাত্মিক সম্বন্ধ প্রবল ও শ্রেষ্ঠ। গুপ্ত মহাশয় কখনও কমলাকান্তকে দেখেন নাই। নব্যভারতে “উপাসনার ভাষা তত্ত্ব” এবং সঞ্জীবনী পত্রিকায় ‘তত্ত্বোপনিষদের’ সমালোচনা দেখিয়া তাঁহার এতই ভালবাসা জন্মিল যে, অপরিচিত কমলাকান্তের সহিত ধর্ম্মানুগত্যে “প্রাণের ভাই” না বলিয়া আর থাকিতে পারিলেন না। বাস্তবিক ধর্ম্মের মিলনেই প্রকৃত আনন্দ। ভৌতিক পদার্থময় শরীরের আসক্তি বশতঃ বাহ্যিক দর্শনেরও একটুক ইচ্ছা ছিল কিন্তু সে ইচ্ছাটী উভয়েরই প্রাণে জাগিয়া রহিল, তাহা আর ইহলোকে পূর্ণ হইল না।

মহামতি গুপ্ত মহোদয়ের হৃদয় ভেদী ব্রহ্মতত্ত্বের আলোচনায় অতি মলিন ভাবাপন্ন মানবেরাও ধর্ম্ম লাভ করিয়াছে। আহা! তাঁহার রচিত "ভাব সঙ্গীত" যিনি একবার আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়াছেন তিনি ভাবের গূঢ় ভাব প্রাণে পোষণ করিয়া বড়ই প্রীতি পাইয়াছেন। সঙ্গীতের ভাষা সরল ও মধুর। কথাগুলি সহজ বটে অথচ উচ্ছাস অতি প্রবল। বস্তুতঃই ভাব সঙ্গীতের ভিতরে ডুবিলে কখনই তাহা ভুলিতে পারা যায় না। যাহা হউক, গুপ্ত মহাশয় যে ঐশ্বর্য্যের প্রলোভনকে পদদলিত করিয়া সার্ব্বভৌমিক প্রেম, রাগানুগা ভক্তি ও উদার দীনতার সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন ভ্রাতৃ তত্ত্বের সখ্যভাবের ঐক্য বন্ধন সুদৃঢ় রাখিয়াছেন, বড়ই আশ্চর্য্য! আবার ইঁহার অনাসক্ত বৈরাগ্য সাধন কেমন সুন্দর তাহাও দেখুন। ইনি সম্ভ্রান্ত জমিদার হইয়া দীন প্রজাদিগের সহিত সঙ্কীর্ত্তনে উন্মত্ত থাকেন এবং একাসনে বসিয়া ধর্ম্মা-লোচনায় পরিতৃপ্ত হন এটি কি সাধন বীরত্ব নহে? সম্মান অভিমান তাঁহার পবিত্র প্রাণে স্থান পাইবে কিরূপে? রাজা প্রজা সম্বন্ধ স্থলে ভ্রাতৃ ভাবটীরই আদর বেশী। কেননা, ভ্রাতৃত্ব তত্ত্বটী ভেদ বিনাশের প্রধান সহায়। তজ্জন্য তিনি অধিকারস্থ প্রজাগণকে অধীনতা শৃঙ্খলে বদ্ধ না রাখিয়া তাহাদিগকে উদার প্রেমে গ্রহণ করিতেন। এরূপ চরিত্রে যে মরুময় শুষ্ক হৃদয়েও ধর্ম্মের বীজ অঙ্কুরিত হইবে, এবিষয় সন্দেহ কি? নিরক্ষর প্রজাগণের সহিত এতদূর সরল ভাবে ধর্ম্ম সাধন করা সহজ নহে। প্রাণে দেব ভাবের আবির্ভাব না হইলে ঈদৃশ সাম্য সাধনে সিদ্ধি লাভ হওয়া সকলের ঘটে না।

আমরা বিশ্বস্ত সূত্রে শুনিয়াছি, ভগবদ্ভক্ত গুপ্ত মহাশয় পূর্ব্ব বঙ্গে বাস নিবন্ধন স্বদেশ ভাষায় সময়োচিত সরল সঙ্গীত রচনা করিয়া অশিক্ষিত প্রজাদিগকে সাধুভাবে আনিবার জন্য একটী উপায় উদ্ভাবন করেন। স্বদেশ ভাষায় উপাসনা বক্তৃতাদি দ্বারা ধর্ম্মের বিশুদ্ধ তত্ত্ব

শিক্ষা দেন। "বুড়ো নাচে পোলার সনে" ইত্যাদি বহুবিধ সঙ্গীতে সংকীর্ত্তনে সকলকে অল্প সময়ে মাতাইয়া ফেলেন। নিজেরও ভাবাবেশে নৃত্য থামে না। এই অপূর্ব্ব দৃশ্য সচরাচর কোথাও দেখা যায় না। একজন সম্ভ্রান্ত জমিদার দীন প্রজাগণের সহিত প্রেমের বন্ধনে আবদ্ধ থাকেন এটী কি দেব ভাবের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত নহে? ঐশ্বর্য্যের তীব্র উত্তেজনার ভিতরে শান্তির স্নিগ্ধ ছায়ায় প্রজাবর্গের সহিত প্রেমে উন্মত্ত হওয়া জগতে এটিও এক অভিনব চিত্র! মানুষ সম্পদ মদে অধীর হইয়া বলিতে কি, আপন সহোদর ভ্রাতাকেও নির্য্যাতন তিরস্কার দ্বারা বিতাড়িত করিতে কুণ্ঠিত হয় না, কত শত অভিযোগ উপস্থিত করিয়া তাহাকে পথের ভিখারী করে, আবার কেহ বা সেই পাশব প্রবৃত্তিকে পরাস্থ করিয়া দেব-ভাবের প্রভাবে প্রাণীমাত্রকে উচ্চ তুলনায় আপনাকে তুচ্ছ মনে করেন। তবেই বলিতে হয়, সংসার বিষে অমৃতে জড়িত, ইহা সাধু সজ্জনেই বুঝিতে পারেন।

সত্য কথা! স্পর্শমণি স্পর্শে কঠিন লৌহও স্বর্ণে পরিণত হয়। সাধু সংসর্গে অসাধুও মলিন ভাব পরিত্যাগ পূর্ব্বক ধার্ম্মিক হইতে পারে। গুপ্ত মহোদয়ের সঙ্গলাভে তাঁহার নিরক্ষর প্রজাপুঞ্জও জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছে। "একাত্ম"ময় ব্রহ্মজ্ঞান ইহার জীবনেই জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। প্রত্যেক শরীরাধারে একই ব্রহ্মশক্তি বর্ত্তমান—আবার ঐ পূর্ণ শক্তিই অর্থাৎ পিতৃশক্তির প্রকার ভেদে যে, প্রাণীমাত্রেই "সন্তানত্ব" সংজ্ঞায় পরস্পর ভ্রাতৃত্বের সখ্য বন্ধনে নিবদ্ধ রহিয়াছে, তাহা প্রত্যক্ষ করা, ইহাইত মুক্ত পুরুষের মধুর ভাব! ইহা গুপ্ত মহোদয়ের একপ্রাণতার পবিত্র ভাবের ভিতরে দেখাযায়, অখণ্ড ভ্রাতৃ প্রেমই তাঁহার একমাত্র হৃদয়ের সঞ্চিত অমূল্য রত্ন। পার্থিব রত্নরাশি তাঁহার নিকট ধূলিকণা হইতেও অসার। পৃথিবীর ধনৈশ্বর্য্য যদি সাধু কার্য্যের কোন অংশে ব্যবহৃত না হয়, তবে সে ধন সম্পদ পাংশুতুল্য, ইহা তিনি বেশ বুঝিতেন। তাঁহার দক্ষিণ

হস্তখানি দুঃখীদিগের প্রতি সান্ত্বনা দিতে বিরত ছিল না! অকপট সেবা ভাবটী তাঁহার প্রাণে বড়ই প্রবল ছিল—সকল অবস্থাতেই আনন্দ যোগে মগ্ন থাকিতেন, কেনই বা থাকিবেন না! প্রেমিকদিগের চাল চলনটা স্বতন্ত্র! তাঁহারা অনায়াসে অসহায় দীন দরিদ্রের মুখচুম্বন করিতে পারেন। মহা প্রেমের তরঙ্গাঘাতে মান সম্মান, অভিমান আর প্রাণে স্থান পায় না। আপন পর প্রভেদ ভাব চলিয়া যায়। মিলনের অমৃত ছায়ায় কৃতার্থ হইতে থাকেন।

আহা! পবিত্র প্রেম কি মধুর! তাহা না হইলে সামান্য একটা প্রবন্ধ ও ক্ষুদ্র পুস্তকখানির সমালোচনা দেখিয়া এত ভালবাসা কোথা হইতে আসিল। গুপ্ত মহাশয়ের উপরি উক্ত উদ্ধৃত চারিখানি পত্রের মর্ম্মপ্রদেশে উপনীত হইলে কি বুঝা যায় না যে, তাঁহার হৃদয় উদার প্রেমে পরিপূর্ণ! কখনও কমলাকান্তের সহিত তাঁহার আলাপ নাই অথচ প্রাণ খুলিয়া প্রীতি সংস্থাপনের জন্য প্রাণের কথা কতই বলিয়াছেন। কথাগুলির বর্ণে বর্ণে যেন অকৃত্রিম প্রেম মাখা রহিয়াছে। যতই পাঠ করা যায়, ততই প্রণয়-পিপাসা বাড়িয়া উঠে। লেখাগুলির ভাষা অতি প্রাঞ্জল কিন্তু উদার ভাবে বড় গভীর! প্রত্যেক কথার মূলে সারগর্ভ কথা সমূহ নিহিত আছে। এইরূপ সরলতাপূর্ণ ভালবাসা সংসারে অল্পই দেখা যায়। অভিমান শূন্য বিনয়ের ভাবটা যেন ইঁহার প্রাণে জীবন্ত রহিয়াছে। পত্রদ্বারা যখন এতদূর প্রেমানুগত্য প্রকাশ পায়, তখন পরস্পর সাক্ষাৎ সম্ভব হইলে মিলনের আকাঙ্ক্ষা জানি না যে কতই আনন্দজনক হইত তাহা কে বলিবে? যাহা হউক, এমন সরলভাবগ্রাহী ভগবদ্ভক্তের সঙ্গলাভ একান্ত প্রার্থনীয়। ইঁহার সংস্পর্শে শুষ্ক হৃদয়ও সরস হয়, অরুচি অসার ভাব পোষিত নিশ্চেষ্ট মানবেরও রুচি-ভক্তি প্রবল হইয়া ঈশ্বরের প্রতি প্রীতি জন্মে।

---

# দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

পাঠক! এই জীবনীর নানা স্থানে, কমলাকান্তের পরম সুহৃৎ শ্রীনাথ রায় চৌধুরীর সদ্ব্যবহার ও সাধুকার্য্যের পরিচয় পাইয়াছেন। সেই পর দুঃখ কাতর রায় চৌধুরী ১৩০৮ সালের ১২ই আষাঢ় পূর্ব্বাহ্ন ৬।০ ঘটিকার সময় হৃৎপিণ্ডে একটী ভয়ঙ্কর বেদনায় হঠাৎ আক্রান্ত হন। অল্প সময়েই সজ্ঞানে প্রসন্ন ভাবে "হরিবোল" বলিয়া পৃথিবী পরিত্যাগ করেন। কমলাকান্ত ও শ্রীনাথ রায় চৌধুরী ইঁহারা পরস্পর অকৃত্রিম অভিন্ন বন্ধু ভাবে জড়িত, সুতরাং কমলাকান্ত নিজের জীবনীতে তাঁহারও বিষয় কিছু বর্ণিত থাকে এরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন। এখানে অতি সংক্ষেপে স্বর্গীয় শ্রীনাথ রায় চৌধুরীর জীবনের কথা কিছু বলিব।

শ্রীনাথ রায় চৌধুরী দেওনাপুরে সেই রাঘব বংশীয় বল্লভীকান্ত রায় চৌধুরীর ঔরসে অম্বিকা চৌধুরাণীর গর্ভে ১২৩৭ সালে আষাঢ় মাসে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালাবধি তাঁহার মেধাশক্তি এত প্রবল ছিল যে, কোন প্রকার জটিল অঙ্ক বা পাঠ সম্বন্ধীয় প্রশ্ন উপস্থিত হইলে তিনি তাহার সদুত্তর এমনই বিশদরূপে দিতেন যে সমপাঠী ছাত্রেরা মস্তক অবনত করিয়া থাকিত। বয়ঃপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে সকল প্রকার শিক্ষায় পারদর্শী হইতে লাগিলেন। পাঠ্যাবস্থাতেও কমলাকান্ত তাঁহার সঙ্গী ছিলেন। শ্রীনাথ রায় চৌধুরী* স্বভাবতই পরদুঃখ কাতর, অতিথি সৎকার পরায়ণ, অতি সাধু-প্রকৃতি সম্পন্ন ছিলেন। এবং যাহাকে যাহা দেওয়া প্রয়োজন মনে করিতেন, ঋণ করিয়াও তাহাকে

* ইনিও সেই হরি ভক্ত গুরুপ্রসাদ ঘোষ মহায়ের নিকট শিক্ষালাভ করেন।

দিতেন। একজন ক্ষুদ্র জমিদার হইলেও ইঁহার জীবনে বিনয়, সহিষ্ণুতা, দেশ-হিতৈষিতাদির ভাব উজ্জ্বলরূপে প্রকাশ পাইত। ইনি শত শত বিপন্নকে অবস্থোচিত উপদেশ প্রদান করিয়া সন্তুষ্ট করিতেন। কার্য্যক্ষেত্রে অবশ্য ভ্রম প্রমাদে না পড়িতেন এমনও নহে, আসঙ্গলিপ্সা বশতঃ কখন কখন বিচলিতও হইতেন, আবার অনুতাপের তীব্র যাতনাতেও অস্থির হইতেন। ফলতঃ ইঁহার ন্যায় মুক্তহস্ত দাতা পুরুষ অতি অল্পই দেখা যায়। অপরিমিত ব্যয় নিবন্ধন অর্থাভাব তাঁহার চিরসঙ্গী ছিল কিন্তু তিনি তাহাতে ভীত বা দুঃখিত হইতেন না। দেখা গিয়াছে স্কুল ও বিদ্যামন্দির স্থাপন প্রভৃতি যে কোন দেশ-হিতৈষিতার কার্য্য উপস্থিত হউক না কেন, সাহায্য প্রার্থী উপস্থিত হইলে সাংসারিক ব্যয় বন্ধ রাখিয়াও ঐরূপ কার্য্যে অর্থ সাহায্য করিতেন। ইঁহার হৃদয়ে আরও একটী সুন্দর ভাব ছিল। অসময়ে অর্থাৎ যে কোন সময়েই হউক হিন্দু মুসলমান যিনিই হউন, উপস্থিত হইলে অতি যত্ন পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে স্থান দিতেন ও শ্রদ্ধা সহকারে ভোজন করাইতেন। এইরূপ উদার ভাব সম্পন্ন মহদ্ব্যক্তির অভাবে স্থানীয় নিরাশ্রয় দীন দুঃখীর যাতনা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। শ্রীনাথ বাবুর ৭১ বৎসর বয়ঃক্রম হইয়াছিল অথচ উৎসাহের অভাব ছিল না। নিজের অভাবের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া পরের অভাব মোচনে সচেষ্ট, এরূপ দৃঢ় প্রবৃত্তির লোক আর প্রায় দেখা যায় না। অধিক কি বলিব, এতদিনে কাঞ্চনতলা গ্রামখানি ঘোর অন্ধকারের অতল তলে প্রবেশ করিল। হায়! কে আর বুভুক্ষিত আতুর অন্ধের মলিন মুখ দেখিয়া অশ্রুপাত করিবে! শ্রীনাথ রায় চৌধুরী হিন্দু সমাজে ছিলেন বটে কিন্তু তাঁহার "একেশ্বরবাদ" ধর্ম্মের প্রতি প্রবল অনুরাগ ও বিশ্বাস জন্মিয়াছিল। প্রকৃত সত্যের নিমিত্ত এমনি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিলেন যে, সত্য অনুষ্ঠানের প্রতি বিন্দুমাত্রও অরুচি ছিল না। তাঁহাকে

কখন পুষ্পচন্দনাদি দ্বারা কোনরূপ পূজা করিতে দেখা যায় নাই। স্পষ্টই জানা গিয়াছে তাঁহার হৃদয়ে অন্তঃপ্রবাহিনী ফল্গু নদীর ন্যায় "একেশ্বর-বাদ" ধর্ম্মের মহা স্রোত সর্ব্বদাই প্রবাহিত হইত। "তত্ত্বকৌমুদী" "ব্রহ্মতত্ত্ব" প্রভৃতি সংবাদ পত্র তিনি প্রেমের সহিত পাঠ করিতেন। ধর্ম্ম পরিব্রাজক বা প্রচারকগণের আগমন হইলে ভক্তি সহকারে তিনি তাঁহাদিগকে ভোজন করাইতেন, তাঁহাদের দ্বারা রীতিমত বক্তৃতা ও উপাসনা করাইতেন। এই সকল অনুষ্ঠানে উৎসাহের সহিত যোগ দিবার জন্য নিজ গ্রামের ভদ্র পরিবারস্থ অনেক স্ত্রী-পুরুষ ও অন্যান্য সম্পর্কীয় ভদ্রগণকে যথোপযুক্ত ভাবে আহ্বান করিতেন। কখন কখন মাঘোৎসবে কলিকাতায় গিয়া উৎসবে যোগ দিতেন, শ্রীনাথ রায় চৌধুরী একজন ধার্ম্মিক উদারচেতা একেশ্বরবাদী ছিলেন। তাঁহার অধ্যবসায় ও যত্নে ধুলিয়ান ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি বিষয় কার্য্যের ভিতরে থাকিয়াও সময়ে সময়ে সাপ্তাহিক উপাসনায় যোগ দিতেন।

কমলাকান্ত চিরসুহৃৎ শ্রীনাথ রায় চৌধুরীর অভাবে বড়ই কাতর হইয়া পড়িলেন। যিনি সুখ দুঃখ রোগ স্বাস্থ্য সকল অবস্থার মূলে, অকৃত্রিম বন্ধু ভাবে তত্ত্বাবধান করিতেন, যিনি দিবসে অন্ততঃ একবার দেখা না দিয়া থাকিতে পারিতেন না, যিনি একদিন না দেখিলে কতই দুঃখ প্রকাশ করিতেন, এহেন মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী বন্ধুর অভাব-সন্তাপ যে কতদূর অসহ্য তাহা অল্পেই বুঝা যায়। কমলাকান্ত অবশ্যই জানিতেন এই ভৌতিক শরীর ধ্বংসশীল! তথাপি সর্ব্বদা বিষণ্ণ ভাবে থাকিতেন, কোন কার্য্যে স্পৃহা ছিল না। দৈহিক ভাব জলের রেখার ন্যায় অস্থায়ী—তজ্জন্য তত কাতর ছিলেন না, কেবল ধর্ম্মালোচনায় সঙ্গীবল হারাইয়া তখন ঐরূপ ভাবে আক্রান্ত হন। স্বর্গীয় শ্রীনাথ রায় চৌধুরী সময়ে সময়ে যে সকল উচ্চ বিষয়ের প্রশ্ন করিতেন, তাহা অতি গভীর ও সারবান্। ব্রহ্মদাস তাঁহার ঐ সকল প্রশ্নের যথাসাধ্য উত্তর দিতেন। আধ্যাত্মিক

ধর্ম্ম-যোগ, যে মধুর হইতেও মধুর! সুতরাং এই অভাবটা কমলাকান্তের পক্ষে অত্যন্ত ক্লেশকর হইয়াছিল।

কমলাকান্ত অধিক সময়েই বলিতেন, ঈশ্বরের দর্শন অভাব অবশ্য সাংঘাতিক বটে, কিন্তু ধর্ম্ম বন্ধুর অভাবও সামান্য নহে। সংসারে ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখা যায়, ঐরূপ নিঃস্বার্থ ধর্ম্মবন্ধু প্রায় কোথায়ও মিলে না! হিন্দু সমাজের মধ্যে "একেশ্বরবাদ" ধর্ম্মের এরূপ দৃঢ় বিশ্বাসী কোথাও ত দেখিতে পাওয়া যায় না! এই আসক্তিপূর্ণ সংসার-আধারে পারদের ন্যায় অনাসক্তভাবে অবস্থিতি করিয়া ঈশ্বর চিন্তায় মগ্ন থাকিতে অল্প লোককেই দেখা যায়। বিবিধ বিষয়িণী চিন্তা মধ্যে এরূপ হৃদয়ভেদী হরিনামের ধ্বনি আর ত শুনা যায় না! ঘোর বিষয়ী হইয়া নানা প্রলোভনের ভিতরে এমন ভগবৎপরায়ণ ব্যক্তি কোথায়? শ্রীনাথবাবু কিরূপ ধৈর্য্যশীল বীরপুরুষ ছিলেন, শুনুন। হাওড়া হইতে তাঁহার উপযুক্ত তৃতীয় পুত্রটীর মৃত্যু সংবাদ আসিল, শুনিবামাত্র কমলাকান্তের আশ্রমে আসিয়া অম্লান বদনে বলিলেন, "সুরেন্দ্রের মৃত্যু হইয়াছে শুনিয়াছ কি? আজ সন্তান গেলেন, কাল বা দুদিন পরে আমাকেও যাইতে হইবে, ভাই! তোমার ভাঙ্গা সুরে একটী কীর্ত্তন কর না?" কমলাকান্ত কিছুকাল ঊর্দ্ধে চাহিয়া রহিলেন। শ্রীনাথ রায় চৌধুরী হাসিয়া আবার বলিলেন, "বুঝেছি, তুমি সুরেনকে ভাব্‌ছ—ভাই তুমিও যদি ইহা ভাব, তবে ত গিয়েছি; ও কথা ভুলে যাও একটী কীর্ত্তন ধর না?" কমলাকান্ত তাঁহার ঈদৃশ ধৈর্য্য, গাম্ভীর্য্য ভাবে বিস্মিত হইয়া কহিলেন, "না না সুরেনের চেহারাটা মনে হয়েছিল!" কমলাকান্ত কীর্ত্তন না গাহিয়া ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের "জীবনবেদ" পুস্তকখানি তাঁহার হস্তে দিলেন। তিনি তাহা আগ্রহের সহিত কিছুকাল পাঠ করিয়া "হরিবোল! হরিবোল!" বলিতে বলিতে বাড়ী গেলেন।

বলুন, এমন হৃদয়বান্ ব্যক্তির জন্য কে অধীর না হয়? কমলাকান্ত

তাঁহার অভাবে ছিন্নপক্ষ পক্ষীর ন্যায় সর্ব্বদা উদ্যম ভঙ্গ হইয়া অবস্থিতি করেন। স্বর্গীয় শ্রীনাথ রায় চৌধুরীর কোন কথা উপস্থিত হইলেই বলিয়া থাকেন, "হায়! আমার এই দুর্গম সাধন-পথে কে আর এরূপ সহায় থাকিবে?" বস্তুতঃই কাঞ্চনতলায় এমন একটী ব্যক্তি নাই যে, তাঁহার সহিত প্রাণ খুলিয়া দুটী ধর্ম্ম কথা হয়, বাস্তবিকই শ্রীনাথ রায় চৌধুরী কমলাকান্তের প্রচার সম্বন্ধেও তাঁহার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

এখানে শ্রীনাথ রায় চৌধুরীর একটা অদ্ভুত দানের কথা বলিব। একজন দরিদ্রের একখানি ক্ষুদ্র খড়ের ঘর ছিল, তাহাতেই স্ত্রী-পুত্র লইয়া কোনরূপে বাস করিত। বর্ষাকাল, ঘরখানিতে খড় নাই, সকল স্থানেই জল পড়ে। লোকটা নিরুপায় হইয়া শ্রীনাথ বাবুকে বলিল, "বাবু! আমার ভাঙ্গা ঘরখানির সকল জায়গাতেই জল পড়ে। ছেলে মেয়েদের লইয়া বড়ই কষ্ট হয়।" শ্রীনাথবাবু বলিলেন, "খড় বাঁশ চাই"—এই বলিয়া অদ্ভুত উপদেশ দিলেন। সেটী এই—"দেখ, বাড়ীতে ছেলেরা বা কোন একটী চাকর যদি ইহা দেখে কিম্বা শুনে তাহা হইলে কিছু হইবে না; তুমি তোমার ঘরের উপযুক্ত খড় বাঁশ পাবে না, হয়ত তাড়াইয়া দিবে। আমার মনে হয় বড় কম পনর তড়পা খড়, ছয়টা বাঁশের দরকার, এত ওরা দিবে না! তাই বলি, সময় মত খড় বাঁশগুলি চুপে চুপে লইয়া ঘরখানি ছেয়ে ফেল। খড়ের পালাটা যেমন আছে ঐ ভাবেই সাজিয়ে রেখ যে, তারা বুঝ্‌তে না পারে।" যিনি কর্ত্তা! সমস্ত ব্যয় করিলেও কাহারও কিছু বলিবার সাধ্য নাই, তিনি ছেলেদের ও চাকরের ভয়ে গোপনে লইয়া যাওয়ার উপদেশ দিলেন এবং কিছু নগদ টাকা দিয়া বলিলেন, "এতে তোমার অন্যান্য খরচ চল্‌বে ত?" লোকটা আশাতিরিক্ত আদেশ ও কিঞ্চিৎ অর্থ পাইয়া কৃতার্থ হইল। "বাবুর জয় হউক" বলিয়া চলিয়া গেল। অল্প আয়ের ভিতরে এরূপ ব্যয়ের ব্যবস্থা সভ্য জগতে কমই দেখা যায়।

শ্রীনাথ রায় চৌধুরীর স্বাভাবিক জ্ঞানে "একেশ্বরবাদ" ধর্ম্মের প্রতি আশ্চর্য্য ভাবে তাঁহার বিশ্বাস ও অনুরাগ জন্মে। তদ্বিষয় একটু না বলিয়া থাকিতে পারা গেল না। তিনি কোন দর্শনশাস্ত্র পড়েন নাই অথচ দর্শন শাস্ত্রের গভীর তত্ত্ব সমূহ সুন্দর বুঝিতে পারিতেন। বেদান্ত দর্শনের আভাস তাঁহার হৃদয় হইতে অনেকটা বিকাশ পাইত। "একাত্ম"ময় ব্রহ্ম মাহাত্ম্যে বড়ই শ্রদ্ধা ছিল। একদিন আলোচনা স্থলে শ্রীনাথ বাবু প্রশ্ন করিলেন, ঈশ্বর ও জীব যদি এক হন, তাহা হইলে উপাসনার তত্ত্বটী যে টেকেনা! কেননা, ঐ উভয় অখণ্ড শক্তির অভিন্নতা জন্য সেব্য-সেবকের বিনাশ হয়, তাহাই বা কিরূপে সম্ভবে, কিন্তু এ কথাও অতি সত্য যে নিরাকারতত্ত্ব অনন্ত ব্যাপী, খণ্ড হয় না। তবে কাকেই বা কে পূজা অর্চ্চনা করে।"

কমলাকান্ত অতি বিনীত ভাবে শ্রীনাথ বাবুকে বলিলেন "দেখুন! আপনি যে প্রশ্নটী করিলেন, উহা এ হেন সামান্য ব্যক্তি দ্বারা মীমাংসা হওয়া অসম্ভব। তবে এই মাত্র বলিতে পারাযায় যে আমরা যতক্ষণ অহমিকামিত্বের অধীনে অবস্থিতি করি ততক্ষণ ব্রহ্ম-সদ্ভাবে উপস্থিত হইতে পারি না। সাধনবলে স্থূলের আকর্ষণ হইতে ঐ অহমিকামিত্ব মুক্তি লাভ করিলে, তখন বুঝা যায় ব্রহ্ম চৈতন্য ও জীব চৈতন্য একই নিরাকার নিত্যরূপে স্থিতি করেন, ইহা কেবল নামের প্রভেদ মাত্র। একমাত্র পূর্ণ চৈতন্যই সেব্যভাবে পূজিত হন, সেবক হইয়া পূজার্চ্চনা করেন। সংসারে দেহীর প্রবৃত্তি বিশেষত্বে তাহার প্রকৃতি পরিবর্ত্তিত পরিলক্ষিত হয় বটে কিন্তু উহা স্থূলজ্ঞানের সংকীর্ণতা ব্যতীত নহে। কারণ, ঐ কলুষিত জ্ঞানের প্রভাবেই সকল প্রকার শরীরাধারে "একাত্ম" মহত্তত্ত্বকে খণ্ড বিখণ্ডে বিভক্ত করে। যাহাহউক, এখানে অতি সংক্ষেপে অদ্বৈতবাদ ও দ্বৈতাদ্বৈতবাদ তত্ত্বের সম্বন্ধে কিছু বলিব। শঙ্করের অদ্বৈতবাদ মতে স্বয়ং চৈতন্য বা আত্মা পূর্ণ। রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ মতে জীব পরমাত্মার

অংশ স্বরূপ। দ্বৈতবাদ মতে জীব ও ঈশ্বর ভিন্ন। নিম্বার্কস্বামী প্রভৃতির অচিন্ত্যাদ্বৈতবাদ মতে জীব ঈশ্বরের তটস্থ শক্তির অংশে ভেদ-শক্তি, কিন্তু শক্তিমানের অভেদ সত্তায় উহা অভেদ। এখন সূক্ষ্ম চিন্তার মূলে উপনীত হইলে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ ও অচিন্ত্যাদ্বৈতবাদ এই উভয় তত্ত্বে দ্বৈতাদ্বৈতবাদ প্রকাশ পাইতেছে। সুতরাং ব্রহ্ম চৈতন্যের জীবভাবের ভেদত্বেও দ্বৈতাদ্বৈতবাদের অখণ্ডত্বের কোন খণ্ডন হইতেছে না। এখন ভাবিয়া, দেখুন, উপরোক্ত বিশিষ্টাদ্বৈতবাদে "পরমাত্মার অংশ-স্বরূপ," এবং অখণ্ড দ্বৈতাদ্বৈতবাদে পূর্ণ চৈতন্যের জীবভাব, এই উভয় সম্বন্ধে ভাবিতে গেলে একটুকু বিশেষত্ব দেখা যায়। কারণ, জীবভাবে অসীমত্ব প্রচ্ছন্ন আছে। তবেই বুঝিবেন, ( অখণ্ড ) চৈতন্যাদ্বৈতবাদেও জীব ও পরমাত্মার একই সত্তা, সসীম শক্তি নহে। সুতরাং ইহাকে বিকৃতাদ্বৈতবাদ বলা যায় না। অখণ্ড দ্বৈতাদ্বৈতবাদও ভ্রান্তির কথা নহে!"

শ্রীনাথ বাবু হাসিয়া বলিলেন, "আমি প্রশ্ন করিলাম—তুমি উত্তর দিতে প্রবৃত্ত হইলে, এই যে আমি তুমির পার্থক্য ভাব এটী কোথা হইতে আইসে?" কমলাকান্ত বলিলেন, "ঐ দুটী তত্ত্বও অখণ্ড ও অক্ষয়। প্রত্যেক মানব-হৃদয়ে এক পরমাত্মাই সেব্য ও সেবক উভয় ভাবে প্রকাশ পাইতেছেন। স্বরূপে ও ভাবে অভেদ মিলনই "নির্ব্বিকল্প-সমাধি"। শ্রীনাথ বাবু প্রশ্নোত্তরে বড়ই সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, "আমার মতের সহিত ঠিক মিলিয়াছে। নিরাকার-তত্ত্ব, উপাধি ধারণে যাহাই হউক্ না কেন, উহা অসীমাত্মক এ কথায় সংশয় কি? পার্থিব পদার্থের সংক্রামক-দোষে আমরা ভেদ-ভাবে আকৃষ্ট হইয়া সাম্য-ভাব গ্রহণ করিতে চাহি না।" এইরূপ নানাবিধ আলোচনার পর তিনি চলিয়া গেলেন।

একদা শ্রীনাথ রায় চৌধুরী প্রান্তর ভ্রমণে গমন করেন। তথাকার

শ্যামল-ক্ষেত্রের সৌন্দর্য্য সন্দর্শনে এবং সান্ধ্য-সমীরণ সেবনে বড় প্রীত হইয়া পরিশেষে কমলাকান্তের আশ্রমে আসিলেন। তৎপর এই কথাটী উত্থাপন করিলেন যে, "বেদান্ত-দর্শন" মতে স্থূল-জগৎ ভ্রম-পূর্ণ। তাহা হইলে, আমরা যে চক্ষে জগতের বস্তু সমূহ দেখিতেছি, ঐ দৃষ্টি-শক্তিতে কি চৈতন্যের প্রকাশ হইতেছে না? ভ্রমময় পদার্থে তবে চৈতন্যের ক্রিয়া কেন হয়? জড়, অজড়, স্থূল, অস্থূল ইহার প্রভেদ অনুভূতিও ত একমাত্র আত্ম-জ্ঞান সাপেক্ষ! যে বস্তু কিছুই নয়, সে বস্তু আবার বস্তু-সংজ্ঞায় আইসে কেন? জড়তত্ত্বময় শরীরেও ত ঐ চৈতন্যেরই স্ফূর্ত্তি দেখা যায়।"

কমলাকান্ত, এই গভীর প্রশ্নের উত্তর এইরূপ সংক্ষেপে দেন। "ভারত-চক্ষু ষড়দর্শন মধ্যে বেদান্তদর্শনই উজ্জ্বল চক্ষু। বেদান্তদর্শন যাহা দেখাইয়াছেন তাহা অভ্রান্ত দর্শন। কারণ, জড়-জগৎ আত্ম-দৃষ্টির আবরণ স্বরূপ। স্থূল-পরমাণু নিত্য সত্ত্বেও, উহার আবির্ভাব তিরোভাব আছে। সমুদ্রের বিম্ব যেমন সমুদ্রে থাকিয়াও ভাঙ্গিয়া যায়, তেমনই জগতের পরমাণু নিত্য হইলেও তাহার স্থূলত্বের বিকাশ ধ্বংসশীল! ঐ বৃক্ষটী শাখা-প্রশাখায় বিস্তৃত হইল, আবার পরমাণুর সহিত মিশিয়া লয় হইয়া গেল, শরীরটী কি তাহাই নহে? শত বর্ষ পরেও তাহা বিনাশ প্রাপ্ত হয়, সুতরাং জড়-জগৎ অনিত্য, এ কথায় সংশয় কি? স্থূল-শরীরে আত্ম-শক্তির প্রকাশ যাহা দেখা যায়, তাহা সম্যক্ প্রকারের দর্শন নহে। ঐ মানুষটী চলিয়া গেল, কতকগুলি কথা বলিল, এখানে দেখিবার ও শুনিবার কর্ত্তা কে? শরীর না আর কেহ আছে? সেই অনন্তব্যাপী চৈতন্যই দেখেন ও শুনেন, শরীরটা কিছুই নয়, একটা যন্ত্র মাত্র। আমরা দৈহিক-ভাব ধরিয়া আত্মাকে পরিমিতরূপে দর্শন করি, বাস্তবিক তখন সসীম বস্তুতে পরমাত্মার অসীম শক্তি পৃথক্ মনে হয়। এজন্য স্থূল-চক্ষুর দৃষ্টি স্বতঃই সঙ্কীর্ণ, উহাকেই অন্ধ-দৃষ্টি বলে।

হৃদয়াকাশে প্রজ্ঞা-চক্ষুর প্রকাশ হইলে স্থূলের সহিত কোনই সম্বন্ধ থাকে না, তজ্জন্য "বেদান্ত-দর্শন" বলিয়াছেন, স্থূল-জগৎ ভ্রান্তিময়। অথচ আমরা দেখিলাম উহা পরমাণুরূপে অস্পর্শভাবে অনন্তেই রহিয়াছে।"

শ্রীনাথ রায় চৌধুরী প্রশ্নোত্তরে সন্তুষ্ট হইয়া আগ্রহ সহকারে বলিলেন, বোধ হয়, রাত্রি ৭টা বাজিয়াছে, দুই একটা আরও আলোচনা চলিতে পারে। ভাল, একটী কথা জিজ্ঞাসা করি, সবিকল্প ও নির্ব্বিকল্প-যোগের বিশেষত্ব কি? এই উভয় যোগের সমন্বয় হইতে পারে কি?" কমলাকান্ত বলিলেন, "ঈদৃশ উচ্চ বিষয়ের মীমাংসা এমন তুচ্ছ ব্যক্তির দ্বারা হইতে পারে না, তবে আপনার আদেশ পালন করাও একান্ত কর্ত্তব্য। ইহার প্রকৃত উত্তর দিতে পারি আর নাই পারি, কথাটী অতি উচ্চ, তাই এ সম্বন্ধে কিছু বলিতেছি।

সবিকল্প-যোগ সকাম-কর্ম্ম-প্রণোদিত। উহাতে জ্ঞাতৃ জ্ঞেয় ভেদ-ভাব আছে। সেই প্রভেদভাব প্রভাবে ঈশ্বরের পূর্ণ শক্তিকে খণ্ডরূপে আনিয়া দেয়, সুতরাং উহা খণ্ড-যোগ জনিত বাহ্য বস্তুর সহিত সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিতে পারে না। স্থূল-বিষয়জাত মোহ-জ্ঞানে অখণ্ড-যোগের অস্তিত্বে বিঘ্ন সংঘটন করে। আমরা তিনটীভাবে সবিকল্প-অবস্থায় প্রবৃত্ত হই বলিয়া, প্রকৃত যোগের মধ্যে প্রবেশ করিতে সমর্থ হই না। ভাব-ত্রয়ের প্রথমটী ঐ গোলাপ ফুলটীর সৌন্দর্য্যে, দ্বিতীয়টী পরিমিত বস্তুর আকারে, এবং তৃতীয়টী গ্রহ উপগ্রহ প্রভৃতি সসীম স্থূল বিরাটরূপে দর্শন-যোগ। কিন্তু ঐ ভাবত্রয়ের দর্শন জন্য প্রকৃত আত্ম-যোগ হয় না। কেননা, কোটী কোটী জগৎ একত্রীভূত হইলেও সীমাবদ্ধ, অসীমের মধ্যে বুদ্‌বুদ্ তুল্য। সুতরাং সাকার বিরাট দর্শন-যোগ, উহা খণ্ড ও অস্থায়ী বলিয়া যেন মনে হয়। সবিকল্প-যোগ ভাবে "ধনং দেহি যশং দেহি" ইত্যাদি প্রার্থনা সকাম সমুৎপন্ন। ইহাতে যে মহামিলনের মধুর যোগ অসম্ভব, তাহা সহজেই বুঝিতে পারেন।

নিষ্কাম-সাধনেই নির্ব্বিকল্প-যোগ হয়। ইহার ভিতরে হঠ-যোগ ও অন্য কোনও প্রকার স্থূল-বিজ্ঞানের ছায়া প্রবিষ্ট হইতে পারে না। ইন্দ্রিয় নিরোধাদির দ্বারা নির্ব্বিকার হইলে ব্রহ্ম-যোগের সরল পথ দেখিতে পাওয়া যায়। এই নির্ব্বিকার বিশুদ্ধ-যোগে যোগী পার্থিব-স্মৃতি বিস্মৃত হইয়া যান, কোন প্রকার ভেদ-জ্ঞান থাকে না। জ্ঞাতৃ জ্ঞেয় প্রভেদ ভাব অভেদ অখণ্ড-জ্ঞানে মিশিয়া যায়, সঙ্কীর্ণ জ্ঞান প্রশ্রয় পায় না। বাহ্য বিকার সমূহ বিদূরিত হইয়া নিষ্কাম সাধন বলে নির্ব্বিকল্প যোগের অধিকার জন্মে। সবিকল্প-যোগের সাহায্যে এই বিশুদ্ধ মহা-যোগ সাধন হওয়া অসম্ভব! আর্য্য ঋষিগণের মধ্যে যাঁহারা ব্রহ্মনিষ্ঠ নিরাকারবাদী ছিলেন, তাঁহারাই নির্ব্বিকল্প-যোগে সমাধিস্থ হইয়া ভূমানন্দ সম্ভোগ করিতেন। ইঁহাদিগকেই সংসারের মায়াময়ী আকর্ষণী-শক্তিতে আবদ্ধ করিতে পারে নাই।

যদি বলেন, যোগী দ্বৈতভাব বিস্মৃত হইলে, তাঁহার আবার দর্শন কি? যদি একমাত্র "আমি" থাকে, তবে আর ভূমানন্দ ভোগের ব্যক্তি কে? এ কথার উত্তরে বলিতে পারা যায় যে, জীবাত্মা পরমাত্মার পার্থক্য থাকিলে নির্ব্বিকল্প-যোগ হইতে পারে না। কেননা, ভেদভাবই এই যোগের বিরোধী। এস্থলে প্রশ্ন হইতে পারে যে, একমাত্র "আমি" থাকিলে, "তুমি"র ভাব কোথা হইতে আসিবে! বস্তুতঃই জ্ঞানের চরম সিদ্ধান্তে উপনীত হইলে, ব্রহ্ম-চৈতন্য জীব-চৈতন্যকে পৃথক্ করা যায় না। কিন্তু এই অভ্রান্ত সত্যেও বলিবার একটা কথা আছে—বস্তু থাকিলে, তাহার ভাবও থাকে। একমাত্র ঐশীশক্তি "আমি" হইলে, 'তুমি' বলিবারও ঐ ঐশীশক্তির শক্তি আছে। এখানে 'আমি' স্বয়ং, 'তুমি' ভাব, উভয়ই অখণ্ড। এস্থলে বলিতে পারা যায় যে, ব্রহ্ম-চৈতন্য ও জীব-চৈতন্যে মহামিলন হইলেই নির্ব্বিকল্প-যোগ হয়।

এখন দেখা যাক্, সবিকল্প ও নির্ব্বিকল্প-যোগের সমন্বয় সম্ভব হইতে

পারে কি না। এই প্রশ্নের মীমাংসা অল্প কথাতেই হইতে পারে। আপনি একটু স্থিরভাবে বুঝিয়া দেখুন, বহির্দৃষ্টিতে ঐ যে বিচিত্র-চিত্র ময়ূরটী দেখিতেছেন, স্থূলের আকর্ষণেও অন্তর্দৃষ্টিতে কি উহাকে দেখিতে পান ? যখন নীল ও লোহিত দুইটী বর্ণে মনশ্চক্ষুর সমদৃষ্টি চলে না, তখন সাকার ও নিরাকারে সবিকল্প ও নির্ব্বিকল্প-যোগ সমন্বয়, ইহাকি সম্ভব হইতে পারে ? নিশ্চয়ই বলিতে পারা যায় যে, সসীম ও অসীমে সামঞ্জস্য, এটি ভাবিবারই কথা! অতঃপর এই উভয় তত্ত্বকে একত্বে পরিণত করিতে গেলে, অনিশ্চিত চিন্তার ভীষণ তরঙ্গে পড়িয়া আকুল হওয়া ব্যতীত আর কিছুই নহে।” শ্রীনাথ রায় চৌধুরী প্রসন্নভাবে বলিলেন, “এখন যাই।” কমলাকান্ত সঙ্গে একটী আলো দিবেন বলিয়া অনুরোধ করিলেন, কারণ সে রাত্রিটী বড় অন্ধকার। শ্রীনাথ রায় চৌধুরী সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, “আজ যথেষ্ট আলো পাইয়াছি আর কেন ?” এই বলিয়া চলিয়া গেলেন।

একদা সন্ধ্যার প্রাক্কালে শ্রীনাথ বাবু কমলাকান্তের আশ্রমে আসিয়া এই কথাটী উত্থাপিত করেন যে, “দেখ! দর্শন শাস্ত্রের আলোচনায় জ্ঞানের উন্নতি সাধিত হয় সত্য, কিন্তু তাহাতে ভক্তির পবিত্র মাহাত্ম্য কিছুই প্রকাশ পায় না। আজ ভক্তি বিষয়ের একটুকু আলোচনা করা যাক্।” কমলাকান্ত অতি বিনীতভাবে এই কথাটী বলিয়াছিলেন যে, “আপনার সম্মুখে কোন কথা বলিতে আমার ধৃষ্টতা প্রকাশ পায়।” শ্রীনাথ রায় চৌধুরী প্রীতি-প্রফুল্ল-হৃদয়ে তদুত্তরে এই কথাটী বলিলেন, “তোমার প্রাণ আমার প্রাণে জড়িত, সুতরাং ভীত বা শঙ্কিত হইবার কারণ নাই।” কমলাকান্ত অতি বিনয়ের সহিত বলিলেন, “দেখুন! আমি ভক্তিহীন হইয়া ঈদৃশ পবিত্র-তত্ত্বের কথা বলিব, এটি কি হাস্যাস্পদ নহে ? তবে আপনার আদেশ পালন করাও একান্ত বাঞ্ছনীয়, এজন্য অতি সংক্ষেপে কিছু বলিতেছি।

ভক্তির পবিত্র-তত্ত্বের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলে প্রাণ বড় আকুল হইয়া উঠে। ভক্তি "ভজ" ধাতু হইতে সিদ্ধ। জগতের সকল প্রকার প্রাণীকে অভেদভাবে হৃদয়ে স্থান দিতে পারিলে, চিত্তের সঙ্কীর্ণতা কিছুই থাকে না। তখনি প্রাণি-জগতের বিচিত্রতার ভিতর দিয়া অভেদ সেবা-ভাব বিকাশ পায়। সেই অকৃত্রিম-সেবা যতই ঘনীভূত হইবে, ততই অকপট দীনতা প্রাণে স্ফুর্ত্তি পাইবে, এবং বিশ্বজনীন পবিত্র প্রেম সহায় হইয়া আসক্তিময়ী অহমিকামিত্বের আপাত প্রলোভনী-শক্তি বিনাশ করিবে। ভক্তি তখন পর্ব্বত-প্রস্থিতা নিম্ন-গামিনী নদীর ন্যায় গতিশীলা হইয়া অভিমানের মস্তক অবনত করিবে ও অনিবার্য্য মধুর উত্তেজনায় আকুল করিতে থাকিবে। সেই সময় সেবানুরক্ত-ভক্ত পথি-মধ্যে ক্ষত শরীর দুর্গন্ধযুক্ত কুক্কুরটীকে বুকে ধরিয়া তাহার সেবায় অজস্র আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন না করিয়া থাকিতে পারে না। সম্মান-গর্ব্ব-ঘাতিনী অহেতুকী-ভক্তি মুহূর্ত্ত মধ্যে সম্পদ-শৃঙ্খলাবদ্ধ মানবগণের ঐশ্বর্য্য-গর্ব্বিত উন্নত মস্তক নত করিয়া দেয়; এবং অবিচ্ছিন্ন সেবা-ভাবে অনায়াসে মুক্তির উজ্জ্বল-ক্রোড়ে তাহাদিগকে উপনীত করে, তখন হৃদয়ে একপ্রাণতার মহাস্রোত ছুটিতে থাকে। ঘোর বিষয়াসক্ত-ব্যক্তিও ভক্তির অভেদ-শক্তির ভিক্ষার্থী হইয়া ভালবাসা ও "সেবা" ধর্ম্মের গূঢ়-তত্ত্ব গ্রহণ করিতে ব্যাকুল হন, এবং পৃথিবীর বৃহৎ ও ক্ষুদ্র, উচ্চ ও নীচ সকল প্রকার প্রাণীর প্রতি প্রীতি করিতে তাঁহার প্রবৃত্তি জন্মে। দেখিতে দেখিতে অকৃত্রিম ভালবাসার অমিয়-তরঙ্গে স্বার্থ-সঙ্কুল কুটিলভাব সমূহ ডুবিয়া যায়। অকৈতব-ভক্তির আশ্রয়ে ভেদ-কলুষিত প্রেমও অতি পবিত্রভাব গ্রহণ করিয়া ভক্তির অপ্রভেদ প্রকৃতির উজ্জ্বলতার সাধন সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সহায় হয়। আর তাহাতে বিচার-বৈচিত্র জ্ঞানের নীরস-কঠোরতার বিন্দুমাত্রও সংস্পর্শ থাকে না। তখনই মূর্খ, জ্ঞানী, ধনী ও দরিদ্রাদির পৃথক্

জ্ঞান বিদূরিত হইয়া সার্ব্বভৌমিক মিলনের অমৃত-প্রবাহে প্রাণ ভাসিতে থাকে।

নীরস বিচার-জ্ঞানের চর্চ্চায় প্রবৃত্ত হইলে, বস্তুতঃই আমরা ভক্তির অভেদ-ভাবকে ম্লান করিয়া ফেলি। কিন্তু ঐ বিচার-জ্ঞানই আবার ভক্তির সেবায় আকৃষ্ট হইয়া প্রেম-বারিধির অতল-তলে রুচি ও প্রীতি প্রভৃতি কত যে অমূল্য তত্ত্ব-রত্ন প্রদান করে, তাহা কে বলিতে পারে? আহা! ভক্তির প্রকৃতি কি সুন্দর! বলিতে কি, নীরস শুষ্ক-জ্ঞান-দলিত মরুময় হৃদয়-ক্ষেত্র, ভক্তির নির্ম্মল-রসে নিমজ্জিত হয়, এবং অনবরত চিত্তকে উল্লাস-তরঙ্গাঘাতে বিস্মিত করে। প্রাণি-জগৎ একতার অমৃতময়-ছায়ায় কি যে এক অনির্ব্বচনীয় শোভা ধারণ করে, তাহা বলা যায় না। দেখিতে দেখিতে মানবের প্রভুত্ব, দর্প ও প্রভাব চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যায়, তখন সে অতি দীন-হীন কাঙ্গালের মত সেবা-নিরত ও রুচি-পরায়ণ হয়। এখানে একটী আপত্তির কথা উপস্থিত হইতে পারে যে, অপ্রভেদ-ভক্তি দ্বারা পরিচালিত হইলে, সংসারের ভেদ-সঞ্জাত বিভীষিকাময় মহাবিভ্রাটে বিপদ সংঘটন হইতে পারে। বিশেষতঃ ইহাতে লঘু-গুরু, ভাবের অভাবে বিষম অনিষ্টের সম্ভাবনা, কেননা, সকল প্রকার প্রাণীকে একাত্মময়-তত্ত্বে ও সমভক্তির আশ্রয়ে রাখিলে, পৃথিবীর প্রাণিসমূহ শাসন-বিশৃঙ্খল জনিত স্বেচ্ছাচারী হইয়া ভীষণ দুঃসহ যাতনা ভোগ করিবে।

ইহার উত্তরে স্পষ্টই বলিতে পারা যায় যে, অন্ধ-জ্ঞানের প্রভাবে আত্ম-শক্তির তারতম্য পরিলক্ষিত হয়। বস্তুতঃ পিতৃত্ব-ভাবের প্রকার-ভেদে যে সন্তানত্ব-ভাব, উহাও সার্ব্বভৌমিক-তত্ত্ব! শ্রেষ্ঠ ও নিকৃষ্টের ভিতরে সন্তানত্বের সমভাবটীও অভ্রান্ত সত্য। এস্থলে অপ্রভেদ-ভক্তির বিশুদ্ধ স্বভাব ভেদ-ভাবে আসিতে পারে না। মানব-গুরু কি পরম-গুরুর সন্তানত্ব-রূপ নিত্য সম্বন্ধের বিষয় অনুধাবন করিয়া প্রাণিমাত্রকে

ভক্তি করিতে পারেন না? মহর্ষি যীশু কোন্ ভাব ধরিয়া শিষ্য-বৃন্দের চরণ ধৌত করিয়াছিলেন? আরও দেখুন, পিতৃ-চরণে পুত্র প্রণত হইলে, পিতা প্রতি-নমস্কার করেন কেন? ইহার ভিতরের গূঢ়-তত্ত্ব এই যে, পৃথিবীর পিতা-পুত্রেও ঈশ্বরের সন্তানত্ব-ভাব অবিচ্ছিন্ন বিজড়িত রহিয়াছে। বিশেষভাবে চিন্তা করিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে, পিতৃ-শক্তি অখণ্ড অব্যয়রূপে কীটাদি পর্য্যন্ত সমস্ত প্রাণীতে পূর্ণভাবে রহিয়াছে। স্থাবর-জঙ্গমাদির অস্তিত্ব একব্রহ্ম সত্তার প্রকাশ পাইতেছে, ইহাই দেখিয়া সাধক গাহিয়াছেন—"জলে হরি স্থলে হরি, অনলে অনিলে হরি।" তবে পশুতে পক্ষীতে হরি, গুরুতে শিষ্যেতে হরি, একি সম্ভবে না? সুতরাং সকল প্রকার শরীরাধারে একই ব্রহ্ম-চৈতন্যকে দর্শন করিয়া ভক্তির অভেদ-ভাব সঞ্চারিত হয়। নদীর যেমন স্থানের প্রতিবন্ধকে গতি রুদ্ধ হয় না, ভক্তেরও তেমনই শ্রেষ্ঠ নিকৃষ্ট বিচারের প্রয়োজন থাকে না, সমভাবে প্রাণী মাত্রেরই নিকট তাহার মস্তক অবনত দেখা যায়। বাস্তবিক ভক্তির ভেদত্বেই মুক্তির-পথ রোধ করে। ধনী ও দরিদ্রে ভক্তির অসামঞ্জস্য-জনিত ভেদ-প্রবৃত্তি প্রবল হইয়া থাকে, এজন্য অভিমানাদির তীব্র-তাড়নায় আমরা অসার হইয়া পড়িতেছি, এবং সুনির্ম্মলা ভক্তিকে কলঙ্কিত করিয়া বিশ্বজনীন প্রেমের মধুর-ভাবকে ভেদ-রূপ কালকূট দ্বারা সঙ্কুচিত করিতে কুণ্ঠিত হইতেছি না। আমরা ঐ অভিমানের বশবর্ত্তী হইয়া ভেদ-ভাবের মোহে আবদ্ধ হই। ঐ প্রতিবেশীটির তিন দিন অনশন-ক্লেশ দেখিয়াও হৃদয়ে একটুকু দয়ার সঞ্চার হয় না, বরং আমরা স্পষ্টই বলিয়া থাকি. "উহাকে ভগবানই ঐ ভাবে রাখিয়াছেন, তাহার সম্বন্ধে আবার কর্ত্তব্য কি?" ঐ সুযোগটী যে দয়া-শিক্ষার সোপান, তাহা যদি আমরা বুঝিতাম, তাহা হইলে, ঐরূপ কঠোর কথা কখনই বলিতাম না। এইটী কি জগচ্চরিত্রের বিচিত্র চিত্র নহে? বস্তুতঃই আমরা অন্ধ-জ্ঞানের দ্বারা পরিচালিত

হইয়া নির্ম্মম ও নীরস-কথায় লোককে নিপীড়ন করিয়া থাকি। ভক্ত স্বার্থ-পরায়ণ ঘোর অভিমানীকেও বুকে ধরিয়া প্রেমাশ্রু বিসর্জ্জন করতঃ আপনাকে কৃতার্থ বোধ করেন। ভক্তের নিকট রাজা ও পথের-ভিখারী উভয়েই সমান ভাবে আদর পায়। উচ্চাসনে ত্রিপণ্ড্রধারী ঠাকুর মহাশয় ও ধরাসনে শতগ্রন্থী মলিন-বস্ত্র পরিধেয় শূদ্র—উভয়েই তুল্য-সেবার পাত্র! কারণ, ব্রহ্ম-চৈতন্য ঐ উভয়ের ভিতরেও একই ভাবে স্থিতি করিতেছেন। পশু পক্ষ্যাদির দেহ-ভাব, বিশ্ব-নিয়ন্তার অচিন্ত্য-লীলার আধার! আমরা বুঝিতে না পারিয়াই ভেদাগ্নির দহন-যাতনা ভোগ করি, ভক্তির সেবা করিতে সমর্থ হই না। আমরা শুষ্ক-জ্ঞানের দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়াই গর্ব্ব-ভরে প্রভুত্ব প্রদর্শন করি। "আমি দেশ-পূজ্য উচ্চ, আমার মস্তক কাহারও নিকট নত হইবার নহে!" এইরূপ গর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়া আমরা নরকের পথ প্রশস্ত করিতে থাকি; মহাজ্ঞানের আলো ধরিয়া ভক্তির পবিত্র-ক্রোড়ে আশ্রয় লইতে চাহি না।

আমরা যেন অভেদ-ভক্তি দ্বারা সেবা-ব্রত সাধন করিতে সমর্থ হই, অসার অন্ধ-জ্ঞানের শাসনে পড়িয়া দীনতার বিশুদ্ধ-ভাব হইতে দূরে না থাকি। দীনতাই ভক্তির সহচারিণী সখী। তাহার আশ্রয়েই মানুষ, চরিত্রকে পবিত্র করিতে পারে। তত্ত্ব-জ্ঞানের প্রভাবে ও অভেদ-ভক্তির সেবা-মহাত্ম্যে, তর্ক-প্রলুব্ধ বিচারাভিলাষী-পণ্ডিতগণেরও যশো-লিপ্সা দূর হইয়া দীনতাকে লাভ করিতে প্রবৃত্তি জন্মে। ভক্তিই মুক্তি-দায়িনী মাতা! ইঁহার অভাবেই ত হৃদয় শ্মশানে পরিণত হয়। তাই বলিতেছিলাম, ভক্তি-সাধন ব্যতীত পরিত্রাণের সরল পথ আর নাই। প্রত্যেক প্রাণীর নিকট উন্নত মস্তক অবনত করিতে পারিলে, অভি-মানের তীব্র-তাড়না থাকিবে না। তখনই সার্ব্বভৌমিক-প্রেমের উদার আলিঙ্গনে প্রাণ জুড়াইবে। অতঃপর আমাদের সকলেরই কর্ত্তব্য যে,

ভক্তির ঐ অভেদ-মন্ত্রে দীক্ষিত হই। বস্তুতঃই সেই 'অভেদ' সেবা-সিদ্ধ মন্ত্রে সাধক, ভক্ত, যোগী সকলেই পরিণামে দীক্ষিত হন। অপ্রভেদ-ভক্তিই অভিন্ন ব্রহ্ম-জ্ঞানের সহিত মিলিত হইয়া যোগারূঢ় ব্যক্তিকে মহাযোগে নিমজ্জিত করে, এবং অখণ্ড সেব্য-সেবকের ভাব বিকাশ পূর্ব্বক জগৎকে শান্তি-প্রদান করে।"

অনেক সময় তাঁহারা এইরূপ জ্ঞান-গর্ভ বিষয়ের আলোচনা করিতেন। কোন দিন ভাল ভাল ধর্ম্ম-পুস্তক পাঠ হইত, কোন দিন কোরাণ ও পুরাণাদির কোন একটী বিষয় লইয়া আন্দোলন চলিত। কোন দিন উপাসনা-তত্ত্বের মধ্যে স্বরূপ-চিন্তা, নাম-সাধন ও নিষ্কাম-প্রার্থনা এই তিনটী প্রকৃষ্ট-পন্থার অনুশীলন করিতেন। কোনদিন বা শাক্ত, সৌর, গাণপত্যাদি পঞ্চবিধ ধর্ম্ম মতের বাহ্য আবরণ উন্মোচন করিয়া আধ্যাত্মিক-ভাবে পরিতৃপ্ত হইতেন। মাঝে মাঝে ব্রহ্ম-সঙ্গীত ও সংকীর্ত্তনও চলিত। কোন সময় ভাল ভাল সংবাদপত্র ও বর্ত্তমান কালের গ্রন্থাদির মধ্যে যে সকল বিশুদ্ধ সমাজনীতি এবং ধর্ম্মনীতি পাইতেন, তাহারই আলোচনা করিতেন। একদা সায়াহ্ন সময়ে শাস্ত্র-প্রসঙ্গ হইতেছে, ইতিমধ্যে কয়েকটী ভদ্রলোক আসিয়া সাংসারিক অসার-কথা তুলিলেন। তখনই শ্রীনাথ রায় চৌধুরী তাঁহাদিগকে স্পষ্টই বলিয়াছিলেন যে, "দেখুন! বাড়ীতে ওসব কথার অভাব থাকে না, এখানেও ঐ কথা! ছি ছি, চিরদিন কি সংসারেই থাকিতে হইবে।" ভদ্রলোক কয়টী লজ্জিত হইয়া উঠিয়া গেলেন। শ্রীনাথ বাবুর কোন নির্দ্দিষ্ট সময় ছিল না, কমলাকান্তের ক্ষুদ্র আশ্রমটীতে প্রায় প্রতিদিনই আসিতেন, এবং প্রীতি-প্রফুল্ল-চিত্তে বলিতেন, "এখানে না আসিলে, প্রাণটা অত্যন্ত অস্থির হয়।"

---

# ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

১৩১০ সালের আষাঢ় মাসে কমলাকান্ত একদিন পুষ্করিণীতে স্নান করিতে যান। ঘাটের সিঁড়ি অত্যন্ত পিচ্ছিল ছিল, তিনি সেই সিঁড়ির উপরে পড়িয়া বাম-পদে গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হন। বহু কষ্টে আশ্রমে আসিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার পা'খানি বড়ই ফুলিয়া উঠিল। ক্রমে ক্রমে বেদনাও প্রবল হইতে লাগিল। এমন কি, আর উঠিবার বা বসিবার শক্তি একবারে রহিল না। এমন একটী লোক নাই যে, একটুকু জল দেয়, অল্পক্ষণ মধ্যেই বড় কাতর হইয়া পড়িলেন। বহু কষ্টে বারান্দায় একখানি মাদুর পাতিয়া তাহাতেই শয়ন করিলেন। এক পদ গমনের সাধ্য রহিল না।

কমলাকান্তের বিপদ শুনিয়া তাঁহার প্রিয়-ভ্রাতা শ্রীমন্ত রায় চৌধুরী তাঁহাকে দেখিতে আসিলেন। ব্রহ্মদাসের ঈদৃশী দুঃসহ যাতনায় তিনি বলিলেন, "দেখুন! আপনার এই শেষাবস্থায় একটী উপায় করা উচিত।" কমলাকান্ত ভীষণ যন্ত্রণায় আক্রান্ত হইয়াও হাসিয়া বলিলেন, "ভাই! যিনি আমার সেবা-শুশ্রূষা করিবেন তিনি নিকটেই আছেন, ভয় কি! কোটী কোটী ব্রহ্মাণ্ডের অগণ্য প্রাণিকে যিনি আহার দিতেছেন, তিনি কি এই নগণ্যকে একমুষ্টি অন্ন দিবেন না?" সেদিন শ্রীমন্ত রায় চৌধুরী খাবার আনিয়া দিলেন। তখনি কমলাকান্ত বলিলেন, "এই দেখ ভাই! তোমার হস্তে প্রভু আমায় খাবার দিলেন।"

বিশ্ব-বিধাতার করুণা অপার! তাঁহার মত সংসারী কে হইবে? তিনি একটী ক্ষুদ্র কীটকেও অভুক্ত রাখেন না, অসংখ্য প্রাণিগণকে অন্ন, জল ও বাতাস দিয়া রক্ষা করিতেছেন। ধন্য তাঁহার প্রাণি-বাৎসল্য

ও সেবা-ভাব! তিনি যে কোথা হইতে কাহার দ্বারা খাদ্য-সামগ্রী বহন করিয়া দেন, ভাবিলে অবাক্ হইতে হয়। ভগবানের কৃপা-মাহাত্ম্যে বিহ্বল হইয়া ভীষণ যাতনার সময়েও কমলাকান্ত যে একটী গীত রচনা করিয়াছিলেন, তাহা এই—

( বাগেশ্রী—আড়াঠেকা। )

এতকি পাতকী সনে ভালবাসা ঘন ঘন।
আড়ালে আঁধারে থে'কে কর কৃপা বরিষণ।
জ্বলন্ত নরকানলে, যে জন সতত জ্বলে,
ছাড়না পাষণ্ড ব'লে, দিতে তারে প্রেম-ধন।
রোগে হাহাকার করে, অবিরত অশ্রু ঝরে,
জল-বিন্দু মুখে ধরে, নাহি হেন জন ;—
কোথা হ'তে কারে লয়ে, অন্ন-জল দাও ব'য়ে,
মায়ের মতন হ'য়ে, কর যে কত যতন।
প্রাণ সঁপে যেই জন, কেড়ে লও ধন-জন,
কর তার আয়োজন যাতনা-রতন ;—
দয়াতে কর যে দান, চূর্ণ কর অভিমান,
পায় পাপী পরিত্রাণ, দুঃখেতে প'ড়ে তখন।

কমলাকান্ত একদিনও উদরান্নের জন্য ভাবেন নাই, কেবল প্রাণ-খুলিয়া উপাসনা ও কাতর-কণ্ঠে গান করিতেন। তিনি সেই মাদুর শয্যায় প্রায় দেড় মাস পড়িয়া ছিলেন। সে সময় বসন্তকুমার ঘোষ, শ্রীমন্ত রায় ও কৈলাসচন্দ্র ঘোষ ডাক্তার সময়ে সময়ে তাঁহার নিকট আসিতেন।

হায়! সংসারের ভিতরে এইরূপ শত শত দৃষ্টান্ত দেখিয়াও প্রাণে একটুকু সাধুভাব গ্রহণ করিতে ইচ্ছা হয় না। কমলাকান্ত আঘাত-

যন্ত্রণা হইতে আরোগ্য হইলে, একদিন শ্রীমন্ত রায় চৌধুরী বলিলেন, "আমি ত ঘোর সংসারী! কিন্তু আপনার বিপদ সময়ের ঘটনাগুলি একটুকু চিন্তা করিলে, বড় আনন্দ ও শান্তি পাই।" কমলাকান্ত বলিলেন, "ভাই! বিপদ ত দুঃখের নহে, উহা সুখের-সোপান! সংসারে পরীক্ষা-বৃক্ষের সুমধুর-ফল যাতনা! উহার ভিতরেই ঈশ্বর-কৃপা নিহিত থাকে। শোক, সন্তাপ ও দুঃখের তাড়নাই ত ভগবানের মঙ্গল-আশীর্ব্বাদ। আমরা বুঝিতে পারি না বলিয়াই, অধীর হই। যে বিষ ভক্ষণে প্রাণ বিনষ্ট হয়, বিষ-কীট সেই তীব্র কালকুট মধ্যে সুখে বাস করে।' তাই বলিতেছি, যিনি অমঙ্গল ঘটনার মধ্যে মঙ্গলময় বিধাতার মঙ্গল-বিধান বুঝিতে পারেন, তিনি সংসারে ধন্য-পুরুষ। দুঃখে কাতর, একমাত্র সুখে সন্তোষ, এরূপ প্রকৃতির বশবর্ত্তী হওয়া কি কর্ত্তব্য? ঈশ্বর যখন যে অবস্থায় রাখেন, তাহাই সুখের নিদান! মানুষের মুখাপেক্ষী না হইয়া ভগবানের প্রতি প্রীতি প্রদর্শন করা, ইহাই ত শান্তি ও সুখ।"

গ্রামের কেহ দেখিতে আসেন নাই বলিয়া, কমলাকান্ত, কিছুমাত্র দুঃখিত হইতেন না, বরং কোনও পরিবার মধ্যে বিপদ উপস্থিত হইলে, যথাসাধ্য সাহায্য করিতে ক্রটী করিতেন না। তাঁহার নাড়ী-দেখা সম্বন্ধে অনেকের বড় বিশ্বাস আছে, এজন্য তিনি গ্রামে ধনী দরিদ্র যাহারই ব্যারামের কথা শুনিতেন, তাহাকে যাইয়া দেখিতেন। একদিন কমলাকান্তকে কোন ব্যক্তি বলিয়াছিলেন, "দেখুন! আপনি পা ভাঙ্গিয়া যখন শয্যাগত ছিলেন তখন কেহ দেখিতে আসেন নাই, এখন আপনার কি সেই সকল লোকের বাড়ী যাওয়া উচিত।"

এই কথা শুনিবামাত্র কমলাকান্ত বলিলেন, "এ তোমার বুঝিবার ভ্রম। জগতের এইরূপ বিচিত্র ঘটনা-তরঙ্গে পড়িয়াই ত ঘোর অশান্তি ভোগ করিতে হয়। তাহাতে কি প্রতিহিংসা করা কর্ত্তব্য? এরূপ হৃদয় ত গরলোৎপত্তির উৎস! যেন ভুলেও প্রাণে এমন নিকৃষ্টভাব

কখন না আইসে। আমি যেন স্বার্থের জন্য ভগবানের নিকট অপরাধী না হই। ধনী ও দরিদ্র সকল শ্রেণীর গৃহে বিনা আহ্বানে যাওয়াই ত মনুষ্যত্বের পরিচায়ক, এবং ঈশ্বরের বিধান-পালন। 'আমার বিপদে কেহ আসিলেন না, আমি কেন যাইব' এরূপ ইচ্ছাই ত নরকের পথ উন্মুক্ত করে। আমরা আপনাকে যতই নিকৃষ্ট ভাবিব, ততই মলিন-ভাব হইতে মুক্ত হইতে থাকিব, দম্ভ, অহঙ্কার ও আত্ম-গরিমা হইতে নিষ্কৃতি পাইব। আর নিজকে যদি উচ্চ ভাবি, তাহা হইলে কখনই বিনীত হইতে পারিব না। সঙ্গে সঙ্গেই ঐ সকল নিকৃষ্ট প্রবৃত্তিতে আকৃষ্ট করিবে, তদ্দ্বারা জগতের অনিষ্টই করিব। তুমি আমার বিপদে সহায়তা কর আর নাই কর, তাহাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু আমি যদি তোমার বিপদে সময়োচিত কার্য্য না করি, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমাকে পশু বলিয়া স্থির করিবে। স্বার্থের অবিরোধে জগতের সেবা করাই ত প্রকৃত সনাতন-ধর্ম্ম। কখনও যেন এমন নীচ-প্রবৃত্তি হৃদয়ে স্থান না পায়। অভিমানীর সুখ সংসারে অতি বিরল। দেখ, কুকুরকে অনেকে যন্ত্রণা দিয়া তাড়াইয়া দেয়, আবার 'তু' বলিলে তখনই বিনীতভাবে নিকটে উপস্থিত হয়, উহার স্বভাবের ভিতরে কেমন দেব-প্রদত্ত সুধা রহিয়াছে, আমরা কি কখন তাহা মনে করি?" এই সকল কথা শুনিয়া লোকটী নত-শিরে বলিল, "মহাশয়! আপনার কথা শুনিয়া বড় প্রীতি পাইলাম। আমার মত নীচ-প্রকৃতি যেন কাহারও না হয়।"

সেই দিন হইতে লোকটীর কি যে একটী ভাব জন্মিল, তিনি অধিক সময় 'কাঞ্চনতলা-প্রচারক্ষেত্রে' আসিতেন। তাঁহার মনের ভাব ক্রমেই উন্নত হইতে লাগিল। একদিন কমলাকান্তকে একটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়! সকলেই বলেন, সংসার কেবলই স্বার্থ-পূর্ণ, ইহার ভিতরে ঈশ্বর-চিন্তা করা, বড়ই অসম্ভব। নিবিড় বন বা কোন প্রকার

নির্জ্জন স্থান ব্যতীত ঈশ্বর-উপাসনা হয় না। বলুন ত, ইহার কোন উপায় আছে কি ?"

কমলাকান্ত তাঁহার প্রশ্নের উত্তরে এই কথা বলিলেন, "ওহে ভাই! তুমি কাঁসারির আফরের কাঁসার স্বভাব ধর। তাহা হইলে এই স্বার্থ-সঙ্কুল সংসারেই ভগবানের ভজন-সাধন সুন্দররূপে করিতে পারিবে। কাঁসারি যেমন আফর হইতে একখণ্ড কাঁসা সাঁড়াশী দ্বারা একাকী ধরিয়া থাকে, আর পাঁচজনে এক একটী হাতুড়ী দ্বারা ঐ ক্ষুদ্র কাংস খণ্ডের উপর উপর্য্যুপরি আঘাত করে ; কিন্তু সকলের ঐ ফাঁকের ঘরের তালটী বোধ আছে। সুতরাং হাতুড়ে হাতুড়ে ঠোকাঠুকি হয় না। কাঁসাখণ্ড ক্রমে ক্রমে বিস্তৃত হইয়া সুন্দর একটী বাটী প্রস্তুত হয়। তেমনই অনিবার্য্য সংসাররূপ অগ্নি-সন্তপ্ত পুরুষকে প্রণয়িনী বলেন—গহনা দাও, পুত্র বলেন—ছাতা-জুতা দাও, কন্যা বলেন—ভাল ভাল চুড়ি ও সেমিজ দাও, এইরূপ নানারূপ পাঁচ দিক হইতে আঘাত পড়িতে থাকে। যিনি কাঁসা-পিটা তালটী ঠিক রাখিতে পারেন, তিনি ঐ কাঁসাখণ্ডের মত ঘাত-প্রতিঘাতে সুন্দর হৃদয়বান্ সাধু-পুরুষ হইয়া উঠেন। সংসারই ত সাধন-ভজনের সুন্দর স্থান, কেন সাধন সিদ্ধ হইবে না ? মনটা হাতুড়-পড়া তালের উপর ঠিক থাকিলেই যথেষ্ট।"

সেই লোকটী আনন্দে বিহ্বল হইয়া বলিলেন, "আমার মত বিষয়-কীট কি কখন ঐরূপ বীর-সাধন করিতে পারে ? দেখুন, এমন একটুকু সময় থাকে না যে, একবার ভগবানকে ডাকি বা সাধু-সজ্জনের সহিত সদালাপে প্রাণে মুহূর্ত্তের জন্য শান্তি পাই। সংসারের অসার কার্য্যেই জীবনটা শেষ করিলাম। শেষের সেই ভয়ঙ্কর দিনটি ভুলেও ভাবিলাম না। কেবল স্বার্থ-কলুষিত বৃথা-চিন্তায় সময় কাটাইলাম। যাহাহউক, আজ প্রাণটা বড়ই শীতল হইল, এই বলিয়া প্রীতিপূর্ণ হৃদয়ে সেই লোকটী চলিয়া গেলেন।"

একদিন কমলাকান্ত বন্ধুগণের নিকট ঐ ব্যক্তিটীর জীবন পরিবর্ত্তনের কথাপ্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন যে, ঈশ্বর-কৃপা একবার মানব-হৃদয় স্পর্শ করিলে, কোনপ্রকার মলিন-ভাব থাকিতে পারে না। আমরা সেই জীবন-সম্বল 'ভগবদ্-কৃপা' প্রাণে গ্রহণ করিতে না পারিয়া ভ্রান্তির অন্ধকার পথে ভ্রমণ করিতেছি। বস্তুতঃই হৃদয়-গ্রন্থের ভিতরে যে গূঢ়-তত্ত্ব নিহিত আছে, তাহা অন্বেষণ না করিয়া অন্ধ-জ্ঞানের দ্বারা পরিচালিত হওয়াতে ব্রহ্ম-বিজ্ঞানে বঞ্চিত রহিয়াছি। নিশ্চয়ই বুঝিতেছি, যে পর্য্যন্ত প্রজ্ঞা-চক্ষুর প্রকাশ না হয়, সে পর্য্যন্ত হৃদয়-গ্রন্থের বিধান সমূহ বুঝা যায় না। 'ভগবদ্-কৃপা' লাভ করিবারও উপায় থাকে না। আবার ইহাও জানিতেছি যে, বিশুদ্ধ রুচি-প্রবলতাই একমাত্র উপায়। ঐ রুচি-শক্তি জীবন্তভাবে প্রাণকে অধিকার করিলে, অহেতুকী-ভক্তির আশ্রয় পাওয়া যায়। তখন ভগবানের দর্শন নিমিত্ত প্রাণ কাঁদিয়া উঠে। পার্থিব-সুখ অসুখের হেতু হয়। সংসার যতই কেন জড়াইয়া ধরুক না, পাকাল-মাছের মত সরিয়া থাকিলে, স্ত্রী-পুত্রদিগের তাড়নায় আর ব্যস্ত হইতে হয় না। ঐ পবিত্র সাধু-চরিত্রে পরিবারবর্গকে ব্রহ্ম-সদ্ভাবে আকৃষ্ট করিয়া ফেলে। ধন্য 'ভগবদ্-কৃপা'! কৃপা-মাহাত্ম্যে অসাধু—সাধু হয়, মূর্খ—জ্ঞানী হইয়া যায়। আহা! ঈশ্বর-কৃপার কি জ্বলন্ত-শক্তি! বেশ দেখা গিয়াছে যে, নিরক্ষর মানব-হৃদয় হইতেও দেব-তত্ত্ব সকল বাহির হইতেছে। তাঁহার উপদেশে শত শত ব্যক্তি সংসার-বন্ধন হইতে মুক্তি পাইতেছেন। আহা! যিনি অসংখ্য প্রাণি-পূর্ণ ব্রহ্মাণ্ডের একমাত্র পরিত্রাতা, তাঁহাকে একবারও চিন্তা করিলাম না। হায়! মায়া-ক্লিষ্ট মানবের একমাত্র ঈশ্বর-কৃপা ব্যতীত যে অন্যবিধ উপায় নাই, এটি কি ভাবিবার কথা নহে?

পাঠক! কমলাকান্তের আবার পরীক্ষার দিন উপস্থিত! ১৩১৩ সালের অগ্রহায়ণ মাসে তিনি হৃৎপিণ্ডের একটী ভয়ঙ্কর রোগে আক্রান্ত

হন। তাঁহার এই বিপদ সময়ে একমাত্র বসন্তকুমার ঘোষ যথোচিত সেবা-শুশ্রূষা করেন। এমন কি, তাঁহার সুশীলা বালিকাদ্বয় দ্বারা অন্ন-ব্যঞ্জন আশ্রমে পাঠাইয়া দিতেন, ঔষধের ব্যবস্থা করিতেও ত্রুটী করিতেন না। সেই ভীষণ রোগ-যন্ত্রণার সময় কমলাকান্তের হৃদয় হইতে যে পঁচিশটা হিন্দী-দোঁহা প্রকাশ পাইয়াছিল, তাহা অতি কষ্টে লিখিয়া রাখেন। আমরা সকলের দৃষ্টির জন্য নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। দোঁহা কয়টী এই—

১

ঘাট অঘাট নাহি দেখে নদীয়া বেগে যায়,
সাধু অসাধু দোনো ঘাটে একি পানী খায়।

২

দীন দরিদ্র ভুকা হোকে ধনীকো সুহৃদ্ ভাবে,
কান্ত কহে সো পাক্কা মূরখ্ আঁধিয়ারামে ধাবে।

৩

চন্দন দরখ্‌কো সাপ জড়ায় শীতল পরিমল ছুটে,
দানী পুরুখ্‌কো কৃপণ্ ঘেরে তওভি দানী ফুটে।

৪

ভিতর ফাকা বাহির ঢাকা ছাপ তিলক বৈরাগ,
কান্ত কহে বুঝ মুঝ্‌কো তুলসী তলকা বাঘ।

৫

সুহৃৎ সুহৃৎ সবকৈ কহে সব্‌মে দেখ ভেক,
ওহি সুহৃৎ হ্যায় বুঝ যিস্‌কা বাহির ভিতর এক।

৬

ক্ষুদ্র তটিনী পর্ব্বত শৃঙ্গে নীচে সিন্ধু ধায়,
প্রেম মিলনকা এইসি কিমিয়া আপসে নদী মিশায়।

২৩

নিম্‌সে মিশে শর্কর যেইসি নিজ রসনা পায়,
দুর্জ্জন পাশে সজ্জন তেইসি সদ্‌গুণ হারায়।

২৪

শত্রু ধনী আদর পায় মিত্র দরিদ্রকে ছোড়ে,
তীব্র হলাহল যতনসে রাখে ক্ষীরকা মট্‌কি তোড়ে।

২৫

খনক দশন সে বিবর বানায় ভুজক করে বাস,
দুর্ব্বল রাজা হোয় তেইসি সবল রাজকা পাশ।

কমলাকান্ত ভয়ঙ্কর রোগ-পরীক্ষার সময়েও হিন্দীভাষায় যে এইরূপ দোঁহা রচনা করেন, ইহাতেই বুঝা যায় যে, মানুষ আসক্তির ক্রোড় হইতে দূরে থাকিলে, বৃথা চিন্তার প্রতি নিবিষ্ট-চিত্ত না হইয়া সৎ-প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইতে পারে। বস্তুতঃই আসক্তির আপাত-মধুর প্রলোভন বড়ই মধুর! তাই আমরা পীড়িতাবস্থায় রোগ-শয্যায় পড়িয়াও অসার কথাই তুলিয়া থাকি। ভুলিয়াও ভগবানের নাম বা কোন সদ্বিষয়ের আলোচনা করি না। যাহাহউক, কমলাকান্ত যে অসহ্য রোগ-যাতনার সময় অবিচলিত-চিত্তে ও সৎ-প্রবৃত্তির বশে এইরূপ হিন্দীভাষায় দোঁহা রচনা করেন, তাহা বড় আশাপ্রদ! এতদ্ভিন্ন তিনি ধর্ম্ম-বিষয়ক অনেক পদ্য-প্রবন্ধ ও সঙ্গীত রচনা করিয়াছেন।

---

# চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

ধর্ম্ম-সাধনে সধর্ম্মী স্বজন-মণ্ডলীর নিতান্ত প্রয়োজন। কেননা, তদ্দ্বারা ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় অনেক গূঢ়-তত্ত্ব প্রকাশ পায়। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ভগবানের অব্যর্থ-শক্তি বিবিধ বিড়ম্বনার ভিতর দিয়াও ফুটিয়া উঠে। শ্রীমন্ত রায় চৌধুরী একজন সঙ্গীত-বেত্তা। তিনি আগ্রহের সহিত আপনা হইতেই "কাঞ্চনতলা-প্রচারক্ষেত্রে" ঘন ঘন আসিতে আরম্ভ করিলেন। ইঁহার ব্রহ্ম-সঙ্গীতে রুচি ও অনুরাগ যথেষ্ট আছে। "পতিত-পাবন এ পাতকী-জন" এই গানটী সর্ব্বদা তাঁহার মুখে যেন লাগিয়াই থাকিত। সাংসারিক কার্য্যের মধ্যেও বলিতে কি, কোন দিন রাত্রি তিনটা পর্য্যন্তও, অতি ভাবের সহিত সঙ্গীত করিতেন। তাঁহার সুললিত-সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া কমলাকান্ত বলিতেন, "শ্রীমন্ত! তোমার গানেই আমার উপাসনার কার্য্য চলিতেছে। শাস্ত্রেও শুনিতে পাই 'গানাৎ পরতর নহি'।" বস্তুতঃ ইহাও চঞ্চল-চিত্তকে স্থির করিবার একটী উপায়। শ্রীমন্ত রায় চৌধুরী সময়ে সময়ে দিবসে আসিয়াও কোন দিন কীর্ত্তন, কোন দিন উপাসনা-তত্ত্বের গীত গাহিতেন। কমলাকান্ত তাঁহার সঙ্গীতে বড় আনন্দ পাইতে লাগিলেন। ঈশ্বর কাহার দ্বারা যে কি ভাবে তাঁহার কৃপার বিকাশ করেন, তাহা কে বুঝিবে? কমলাকান্ত অন্য ধর্ম্ম-বন্ধুর সঙ্গলাভে বঞ্চিত থাকিয়াও অভাব মনে করিতেন না। কেননা, তাঁহার সে অভাবটী শ্রীমন্ত রায় চৌধুরীর দ্বারা পূর্ণ হইত।

শ্রীমন্ত রায় চৌধুরীর একেশ্বরবাদ-ধর্ম্মের প্রতি যথেষ্ট অনুরাগ। সামাজিকতার দৃঢ়-বন্ধনে জড়িত থাকিয়াও, তিনি প্রকৃত সত্যের নিমিত্ত উদাসীন নহেন। একটুকু অবসর পাইলেই ক্ষুদ্র আশ্রমটীতে আসিয়া

সন্দেহ-বিষয়ের প্রশ্নোত্থাপন পূর্ব্বক, আলোচনা দ্বারা সংশয়-ভাবটী মীমাংসা করিয়া লন। বস্তুতঃই এই ভীষণ সঙ্কট-সঙ্কুল সংসারের বিভীষিকাময় স্থানে সত্যের প্রতি রুচি ও আকাঙ্ক্ষা রাখা এটিও সামান্য নয়।

যাহাহউক, এই ভাবে কমলাকান্ত কাঞ্চনতলা-প্রচারক্ষেত্রে সেবা-নিরত হইয়া অনেকটা শান্তি অনুভব করেন। মাঝে মাঝে উপাসনার পর যে সকল গীত তাঁহার প্রাণে প্রকাশ পাইত, তাহা শ্রীমন্ত রায় চৌধুরী অতি যত্নের সহিত শিক্ষা করিয়া কমলাকান্তকে শুনাইতেন। সঙ্গীত শেষ হইয়া গেলেও, ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় অনেক কথা চলিত। আলোচনা-সূত্রে ভাল ভাল তত্ত্ব-কথা অনেক আসিয়া পড়িত। এখানে একদিনের একটী কথা বলিব। শ্রীমন্ত রায় চৌধুরী বলিলেন, "ভাল জিজ্ঞাসা করি, সাকার-অনুষ্ঠানের ভিতরে থাকিয়া "একেশ্বরবাদ" ধর্ম্ম পালন করা যাইতে পারে কি না?" ব্রহ্মদাস তখনি উত্তর দিলেন যে, "কেন পারা যাইবে না? পাকাল মাছটী কর্দ্দম-কলুষিত জলে বাস করে, কিন্তু তাহার গায় কাদা লাগে না! কারণ, তাহার শরীর এমনি স্বচ্ছ যে, কোনরূপ মলিন বস্তু তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। মানব-প্রকৃতিও যদি তদবস্থভাবে গঠিত হয়, নিশ্চয়ই বুঝিবে, তাহার প্রবৃত্তি শুভভাবে পরিণত হইয়া সত্যের সরল-পথে আসিবেই আসিবে। সদসৎ নির্ব্বাচন-শক্তি একমাত্র মনের প্রতি নির্ভর করে। মন যদি ইচ্ছা করে যে, "ঐ বাক্সটা লইব" তখনি পা চলিল, হাত বাক্সটী ধরিল। আবার সেই মনই সৎ-সঙ্গ-লাভে নিষ্কলঙ্ক হইয়া বিশুদ্ধ-পথে চালিত করিতে পারে। অতঃপর চিত্ত-সংযম দ্বারা ভগবত্তত্ত্বে কাহারও অক্ষুণ্ণ অনুরাগ জন্মিলে, ঘোর অন্ধকারের ভিতরেও তিনি সত্যের আলো দেখিতে পান; এবং সাধনে সিদ্ধ হইয়া বিমলানন্দ ভোগ করিতে সমর্থ হন। যিনি এই অসার

সংসারের তুঙ্গ-তরঙ্গে পড়িয়াও স্থিরভাবে থাকিতে পারেন, তিনিই বীর-সাধক! তাঁহার ঐ পবিত্র জীবনাদর্শে শত শত মায়াক্লিষ্ট মানবও, ধর্ম্মের সূক্ষ্মতত্ত্ব বুঝিয়া ভগবদ্ভাবে বিহ্বল হন। সেই সাধুভাব সংস্পর্শে তাঁহার পরিবারবর্গও সংসারকে স্বর্গে পরিণত করিয়া তুলেন। একদিকে ভাবিতে গেলে পুত্র-কলত্রে মিলিত হইয়া পবিত্রভাবে ধর্ম্মসাধন, ইহাই বীরসাধন। কিন্তু একটুকু মতের বৈষম্য ঘটিলেই যে, তখনি পিতামাতা বন্ধুবান্ধবকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভস্ম মাখিয়া বনেই যাইতে হইবে, তাহা নহে। হৃদয়ের দুর্গম-বনে, লোভ, মোহ, দম্ভ ও দ্বেষ-হিংসা প্রভৃতি ভীষণ জন্তু সকল বিচরণ করিতেছে, তাহাদিগকে বশীভূত করিতে না পারিলে, গিরিগহ্বরে গেলেও কিছু হয় না। সংসার যতই কেন বিঘ্ন-বিড়ম্বনার স্থান হউক না, চিত্তসংযমই সাধনের সহায়। বাহ্য আড়ম্বরে "কালী তারা মহাবিদ্যা" বা "হরি" নামের নামাবলী গায় দিয়া, কোন ফল পাওয়া যায় কিনা জানি না। ঈশ্বর যে প্রাণ বুঝেন! সম্যক্‌রূপে প্রাণটী সঁপিয়া না দিলে বনেই যাই, আর কাশী গয়া বৃন্দাবনই যাই, যেমন যাওয়া তেমনই আসা; আশা পূর্ণ হয় না। তাই বলিতেছি, ঈশ্বরে একাগ্রতাই একান্ত বাঞ্ছনীয়।

এইরূপ বিবিধ প্রশ্ন উঠিত। এতদ্ভিন্ন গার্হস্থ্য-ধর্ম্মের কথাও বিশুদ্ধ-ভাবে চলিত। তৎসম্বন্ধে সংক্ষেপে একটী কথা বলিতেছি। শ্রীমন্ত রায় চৌধুরী একদিন দুঃখের সহিত বলিয়াছিলেন, "দেখুন! আমি ত অধিক সময়ই সংসারের কার্য্যে ব্যাপৃত থাকি। অবসর পাইলে এখানে আসিয়া যেটুকু আনন্দ পাই, তাহা বাড়ী আসিলেই শিশির কর্পূরের মত বাতাসে উড়িয়া যায়, ইহার কোন উপায় আছে কি?" কমলাকান্ত হাসিয়া বলিলেন, "কেন থাকিবে না? এ সম্বন্ধে সাদাসিদে একটী নিজেরই কথা বলিতেছি, যদিও আত্ম-বিষয় ব্যক্ত করা অতীব দোষণীয়, কিন্তু এটী প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত বুঝিয়া অগত্যা বলিতে হইল। বলি, শ্রীমন্ত!

তোমার কি মনে পড়ে? আলখেলা সেলাইয়ের প্রতিজ্ঞা? সূচিটীর প্রত্যেক ফোঁড়ে 'ওঁ ব্রহ্ম' বলিয়া গাত্র-বস্ত্রটী প্রস্তুত করা হয়। তেমনই ঈশ্বরের নামরূপ অসংখ্য ফোঁড়ে সংসারটীকেও একটী আল-খেলা গড়াইয়া লইলে, ভগবচ্চিন্তা ও গার্হস্থ্য-ধর্ম্ম প্রভৃতি সমস্তই চলিতে পারে। রুচি, ভক্তি, প্রীতি, বিবেক, বৈরাগ্য ও অনুরাগাদির অবি-চ্ছিন্ন সঙ্গলাভ কেন হইবে না? প্রাণে ভগবদ্রুচি না জাগিলে, বাহ্যিক পুষ্প, চন্দন, ধূপ, দীপ ও নৈবিদ্যাদির দ্বারা কিছু হয় না। আত্মোৎসর্গই ঈশ্বরের প্রকৃত পূজা। গার্হস্থ্য-ধর্ম্মের মধ্যেও চিন্ময়ী-মহাশক্তির আরাধনা হইয়া থাকে। "ব্রহ্ম" যে মাতৃভাবেও নিত্যকাল রহিয়াছেন, তাঁহার আহ্বানও নাই, বিসর্জ্জনও নাই। সাধক ধ্যান-যোগে তাঁহাকে হৃদয়ে দর্শন করেন।

আবার বলি, ঐ শিশির কর্পূর উড়িয়া যাওয়ার কথাটী! তন্ময়-চিত্তে যিনি হৃদয়-শিশিতে নামরূপ কর্পূর ভরপূর রাখিতে পারেন, তিনি কখনই সংসারের বাতাসে উহা উড়িয়া যাইবে বলিয়া ভয় পান না। কেননা, তাঁহার হৃদয়-শিশিটী যে ভগবদ্-রুচির আবরণে সতত আঁটা থাকে। কিন্তু তৎসম্বন্ধেও একটী সাংঘাতিক বিপদ আছে। ঐ ভগবদ্-রুচিকে যদি আবার অরুচি চাপিয়া ধরে, তাহা হইলে আর উপায় থাকিবে না। এ বিষয় সর্ব্বদা সতর্ক থাকা উচিত। সে একবার স্পর্শ করিলেই যে, আর নিস্তার নাই। ক্রমে ক্রমে বিষয়-পাণ্ডুরোগে মানবকে অসার করিয়া ফেলে, এটি বড়ই আশঙ্কার কথা! আমরা সৎসঙ্গলাভে "ভগবদ্রুচি" এই জীবন-সম্বলটী লাভ করি সত্য; কিন্তু আবার অসৎ-সঙ্গী হইয়া তখনি তাহা হইতে বঞ্চিত হই। তজ্জন্য সাধুসঙ্গ অথবা অকপট ধর্ম্ম-বন্ধুর প্রয়োজন।" শ্রীমন্ত রায় চৌধুরী অতি আগ্রহের সহিত বলিলেন, "বন্ধুত্বের বিশুদ্ধতত্ত্ব কি, শুনিতে বড় ইচ্ছা হয়, সংক্ষেপে একটুকু বলুন।"

কমলাকান্ত বলিলেন, "শ্রীমন্ত! সংসারে বন্ধু দুইটীভাবে বিভক্ত। একটী সম্পদে, অপরটী বিপদে। এখন দেখা যাক্, এই উভয় বন্ধু-ভাবের মধ্যে সামঞ্জস্য আছে কিনা? বস্তুতঃই ঐশ্বর্য্যভোগী ধনী ও দুঃখ-সন্তাপগ্রস্ত দরিদ্রের একত্ব-সংঘটন হওয়া বড় দুরূহ। বলিতে কি, সংসারবাসীর পক্ষে ইহা সহজ বলিয়া মনে করিতে পারা যায় না। কারণ, তাঁহাদিগের ভিতরে উচ্চ-লঘুতার অভিনয় যথেষ্টই দেখা যায়। একা সংসারবাসী কেন, গৃহত্যাগী কৌপীন-কমণ্ডলুধারীর মধ্যেও উহা দেখা যায়। লোকে কথায় বলে "ভেকে ভিখ" ঐযে রামাত-জামাত দলেও একজন ঠাকুর-পূজা করিতেছেন, অন্য একজন সমভাবসম্পন্ন সাধু তিনি ঘোড়ার দানা ভিজাইতেছেন। মোহান্ত-প্রভু কি ঐ অশ্ব-রক্ষক সাধুটীকে সমভাবে গ্রহণ করেন? কখনই না। তিনিও ভেদ-প্রকৃতির উগ্রমূর্ত্তির সম্মুখে স্থির থাকিতে পারেন না। তবেই বলিতে পারা যায়, সম্মানিত ব্যক্তির সহিত দরিদ্রের প্রণয় সংঘটিত হওয়া অস্বাভাবিক। সম্পদের ভিতরে দীনতার পবিত্রভাব সাধন করিতে পারেন, এরূপ উদারভাব-গ্রাহী সাধু-পুরুষ পৃথিবীতে অল্পই দেখা যায়। বিশেষতঃ বর্ত্তমান সময়ে—জ্ঞানী, ধ্যানী, ধনী ও মানী সকলেরই প্রাণে সম্মান-সুখ-স্বার্থ-প্রণোদিত ভেদবীজ অঙ্কুরিত হওয়া অত্যুক্তির কথা নহে। এমন কি, সধর্ম্মপরায়ণ পরম সুহৃদ্ মধ্যেও ঐ বীজ গজাইয়া থাকে। এখানে অকৃত্রিম বন্ধুভাবের একটী দৃষ্টান্ত দেখাইতেছি। ঐযে প্রতিবেশীর বড় ঘরে আগুন লাগিয়াছে, সম্পদের বন্ধু অনেকেই আসিয়াছেন, কেহ বলিতেছেন 'জল আন' কেহ বলিতেছেন 'দমকলের চেষ্টা কর।' কিন্তু ঘরের ভিতরে একটী ক্ষীর-কণ্ঠ শিশু রহিয়াছে। স্থানে স্থানে আগুন ঝপ্ ঝপ্ পড়িতেছে, পিতামাতা ও সম্পদের বন্ধুগণ দাঁড়াইয়া আছেন, কেহই ঘরে প্রবেশ করিতে সাহসী নহেন। হঠাৎ একজন দরিদ্র মাথা ভিজাকাঁথা ধরিয়া, তড়িদ্বেগে শিশুটিকে বুকে

লইয়া আসিল। এখানে বন্ধু কে? আমি বলি, ঐ দীন-দরিদ্র কাঙ্গাল, তিনিই প্রকৃত বন্ধু। তবেই বেশ বলিতে পারা যায়, বিপদের বন্ধুর নিকটে সম্পদের বন্ধু আসিতেই পারেন না। এখানে পিতামাতাও সেই আগন্তুক দরিদ্র-বন্ধুর সম্মুখে উপস্থিত হইতে লজ্জিত ও কৃতজ্ঞতা-পাশে চিরবদ্ধ।

একমাত্র ঈশ্বরই অক্ষয়-সুহৃদ্। তাঁহারই প্রেরিত পবিত্র প্রেমের বলে, মানুষ জ্বলন্ত অগ্নিকেও উপেক্ষা করিয়া বিপন্নের জন্য অশ্রু বিসর্জ্জন করে। ঐশ্বর্য্য-স্পৃহা প্রবল থাকিলে, বিশুদ্ধ ধর্ম্মভাবও মলিন হইয়া যায়। সম্পদ্‌ভোগী সম-ধর্ম্মাবলম্বিকেও দেখা গিয়াছে, সম্মানের তীব্র-শাসনে অতি ধর্ম্মপরায়ণ দরিদ্রের জীর্ণ গৃহে উপস্থিত হইতে পারেন নাই। অতঃপর ধনীর সহিত দরিদ্রের সখ্যতাবন্ধন নিতান্ত অসম্ভব। ভগবদ্‌-কৃপা ব্যতীত অকপট দীনতা ও অভেদ সেবা-ভাব জন্মে না। বস্তুতঃই দুঃখের কশাঘাতেই আধ্যাত্মিক-তত্ত্ব বুঝিতে পারা যায়। এবং বন্ধুত্বের গূঢ়ভাবে প্রাণকে বিহ্বল করে। কিন্তু সম্পদের মধ্যে যতই কেন দীনতার প্রতি লক্ষ্য থাক্ না, কিছুতেই আত্মাভিমান-টুকু ছাড়িয়া যায় না। যিনি অতুল ঐশ্বর্য্যভোগে থাকিয়া দরিদ্রের মলিন ও কাতর মুখ দর্শনে তাহাকে অকৃত্রিম প্রেমের সহিত আলিঙ্গন করিতে লজ্জাবোধ করেন না, বাস্তবিক তিনিই প্রকৃত বন্ধুত্বের অধিকারী। ফলতঃ সম্পদ্-সম্পৃক্ত সংসারবাসীর পক্ষে এটী বড় সহজ বলিয়া মনে হয় না। কারণ, আমরা বিশ্ব-বিধাতার বিচিত্র কৌশলের প্রতি লক্ষ্য রাখি না। আজ যেস্থানটী কজ্জলনিভ-কলনাদিনী তরঙ্গ-তরঙ্গিনীর বিশাল বক্ষঃ পোতমালায় সুশোভিত, কিছুদিন পর সেই স্থানটী নবীন-নিবিড়-শ্যামল-শস্যক্ষেত্রে পরিণত; নগর অরণ্য—অরণ্য নগর হইতেছে। ধনী দরিদ্র হইতেছে, দরিদ্র ধনী হইতেছে, সকলি বিচিত্র! বিশ্বপতির বিশ্বরহস্যের গূঢ়তত্ত্ব বুঝিতে না পারিয়া, আমরা

অনিশ্চিত বিষয়ের প্রতি প্রীতি ও নিশ্চিত বিষয়ের প্রতি অপ্রীতি প্রদর্শন পূর্ব্বক অশান্তির ক্রোড়ে সুখে নিদ্রা যাইতেছি। ধন, জন, যৌবন সকলই যে জলবিম্বর ন্যায় ক্ষণস্থায়ী—ইহা দেখিয়াও প্রাণ জাগিয়া উঠে না। অসার বিভব-গর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়া পরিণাম চিন্তা করি না। শরীর-সৌন্দয্য ও বলবীর্য্য ইহাও যেন চিরদিন থাকিবে, নিরবচ্ছিন্ন সুখৈশ্বর্য্যের অবিচ্ছিন্ন-তরঙ্গে ডুবিয়া রহিব, এই ত অভ্রান্ত বিশ্বাস। কিন্তু কখন যে কালের অতল-উদরে ধন, জন, জীবন সকলই প্রবেশ করিবে, এটি একবারও আমরা মনে করি না। অসার সম্মান-গৌরবের উত্তেজনায় ভবিষ্যৎ-চক্ষের দৃষ্টি অজ্ঞানতার অন্ধকারে প্রচ্ছন্ন রাখি। সুতরাং ভাবি-চিন্তার প্রতি উদাসীনতা উপস্থিত হয়। এই জন্যই বলিতেছিলাম, ধনীর সহিত দরিদ্রের বন্ধুতার সামঞ্জস্য কতদূর সম্ভবপর সহজেই বুঝা যায়।

এইরূপ বিবিধ বিষয়ের আলোচনা হইত। শ্রীমন্ত রায় চৌধুরী অধিক সময়ই আশ্রমে আসিয়া সঙ্গীতাদি করিতেন। একদিন আলোচনার মধ্যে কমলাকান্ত দশটী কথা বলিয়াছিলেন, ঐ "দশটী কথা" বড় সহজ অথচ সকলেরই একটুকু দেখিবার বিষয়। আমরা তাহাই ভাবিয়া এখানে উদ্ধৃত করিলাম। কথা দশটী এই—

১। "শত্রুকে ভালবাস, বন্ধুতা জন্মিবে।

২। নিন্দুককে বুকে ধর, আত্ম-দৃষ্টি ফুটিবে।

৩। দরিদ্রকে দান করিলে, দান-শিক্ষা হইবে।

৪। ধনী হইতে দূরে থাক, দীনতা আসিবে।

৫। বহু-ভাষীর নিকট, নীরবে ধৈর্য্যধারণ কর।

৬। শিশুর কোমল প্রাণে সরলতা দেখ।

৭। নিজকে নীচ ভাবিলে, অহঙ্কার ঘুচিবে।

৮। পাপের জন্য অনুতাপ কর, শান্তি পাইবে।

৯। অভিমান গেলে, উদারভাব প্রকাশ হয়।

১০। অভেদ-ভাবে সেবা কর, প্রেমের মাহাত্ম্য বুঝিবে।"

এই দশটী কথা অতি সরল। সকল সময় যদি স্মরণ রাখা যায়, তাহা হইলে, অবশ্যই উহা দ্বারা বিশেষ উপকার হইতে পারে। কেননা সামান্য কথাটীতেও যথেষ্ট উপদেশের কার্য্য করে।

এইরূপে কমলাকান্ত নানা উপায়ে ধর্ম্মপ্রচার করিতে লাগিলেন। পরিশেষে বার্দ্ধক্য নিবন্ধন ভ্রমণ-পরিশ্রমে, অসমর্থ হইয়া আশ্রমেই যথা-সাধ্য সাধন-ভজনে নিযুক্ত রহিলেন। আমরা নানা প্রকার অসুবিধা বশতঃ তাঁহার জীবনের সমস্ত ঘটনা প্রকাশ করিতে পারিলাম না। ১৩১৩ সাল পর্য্যন্ত কয়েকটী ঘটনামাত্র বর্ণিত হইল। ঐ বিষয়গুলি সুযোগ পাইলে অথবা শেষ-জীবনের সহিত প্রকাশের আশা রহিল।

---

